وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ
তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَآءٌ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে
বলো না যে তারা মৃত, বরং তারা জীবিত।"
(সুরা বাকারা : ১৫৫)

# তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন

## (দু'জন শহীদ স্মরণে)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা


| | |
|---|---|
| প্রকাশক | **মাহবুব হোসেন**<br>ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত<br>আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ<br>৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ |
| ভাষান্তর | **নাজির আহমদ ভূঁইয়া** |
| সম্পাদনা ও চলিতকরণ | **মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়** |
| প্রকাশকাল | জানুয়ারি, ১৯৯২ইং<br>**২৭শে মে ২০০৯ইং** |
| সংখ্যা | ২০০০ কপি |
| মুদ্রণে | **বাড-ও-লিভস্**<br>২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন<br>মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। |

**Tadkiratush Shahadatain**

Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ধর্মের ইতিহাসে শাহাদাত বরণ একটি অনন্যসাধারণ অধ্যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কপর্দকহীন সাহাবারা যখন শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে শাহাদাত বরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন তখনই বিজয় মুসলমানদের পদচুম্বন করেছে। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ ধর্মের জন্য মৃত্যুবরণকারীকে 'জীবিত' বলেছেন।

কিছু-কিছু শাহাদাত গুণ ও মর্যাদায় দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে। সাহেবযাদা হযরত মৌলভী আব্দুল লতিফ (রা.) ও তার শিষ্য হযরত মৌলভী শেষ আব্দুর রহমান (রা.)-এর মৃত্যুতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই বইটি লিখেন। এই বই লেখার বাইশ বছর আগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে ইলহামযোগে জানানো হয়, "দুটি ছাগল জবাই করা হবে"। তিনি (আ.) লিখেন নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! যেভাবে তিনি হযরত সাহেবজাদা সাহেব আমার সত্যায়নের পথে মৃত্যুকে গ্রহণ করেন এ ধরনের মৃত্যু ইসলামের তেরশত বছরের ইতিহাসে সাহাবাগণের (রা.) উদাহরণ ব্যতীত অন্য কোথাও দেখতে পাবে না।"

এই দুই মরহুমের শাহাদাতের বর্ণনা ছাড়াও মুসায়ী মসীহ ও মুহাম্মদী মসীহর মধ্যে ষোলটি সাদৃশ্য ও তার নিজের সত্যতার প্রমাণ দেখিয়েছেন গ্রন্থকার ।

এ বইটির ফারসি কবিতাটি নতুন আঙ্গিকে কাব্যরূপ দান, বইটি চলিতকরণ ও প্রুফ রিডিংয়ের কাজটি সম্পাদন করেছেন জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়। মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে কাজ করেছেন জনাব আব্দুল কুদ্দুস । এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।
মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

ওয়াসসালাম
খাকসার

**মোবাশশের উর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

ঢাকা
২৭ মে, ২০০৯ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

# মুখবন্ধ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর 'বারাহীনে আহমদীয়া' কিতাবের ৫১১ পৃষ্ঠায় شاتان تذبحان "তোমার জামাতের দু'টি ছাগলকে জবাই করা হবে"–এই ভবিষ্যদ্বাণীটি লিপিবদ্ধ করেন। খোদাতায়ালার কিতাবের বাগধারা অনুযায়ী নির্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ছাগলের সাদৃশ্য বলা হয়ে থাকে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল আফগানিস্তানের খোসত এলাকায় শহীদ মৌলভী মুহাম্মদ আবদুল লতিফ ও তাঁর সুযোগ্য মুরীদ শহীদ আবদুর রহমান সম্পর্কে, যা 'বারাহীনে আহমদীয়া' রচনার ২৩ বৎসর পর পূর্ণ হয়।

সাহেবযাদা মৌলভী আবদুল লতিফ সাহেব কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কাবুল রাজ্যে তার কয়েক লক্ষ টাকার জায়গীর ছিল এবং ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষেও তার অনেক জমি ছিল। কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানের দিক থেকে তাকে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম মনে করা হতো। আফগানিস্তানের নতুন আমীরের অভিষেক অনুষ্ঠান তার হাতে সম্পন্ন হয়েছিল এবং আমীরের মৃত্যু হলে তার জানাযার নামায পড়ার জন্যও তিনিই মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। কাবুল রাজ্যেও প্রায় ৫০ হাজার মানুষ তাঁর শিষ্য ও ভক্ত ছিল, যাদের মধ্যে কেউ-কেউ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন। 'মৌলবী' পদবী ছাড়াও তিনি আফগানিস্তানে 'সাহেবযাদা', 'আখওয়ান্দযাদা' এবং 'শাহযাদা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

আখেরী যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর উপর ইমান আনার দরুণ কাবুলের এহেন মহান নেতা ও আলেমকূলের সূর্য মৌলভী সাহেবযাদা আবদুল লতিফ সাহেবকে আমীর হাবিবুল্লাহ খানের নির্দেশে ১৯০৩ সনের ১৪ ই জুলাই কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে প্রকাশ্যে পাথর নিক্ষেপ করে নৃশংসভাবে শহীদ করা হয়। মরহুম মৌলভী সাহেবযাদা আবদুল লতিফ সাহেবের শাহাদাতের আনুমানিক দুই বৎসর পূর্বে তাঁর প্রিয় শিষ্য মিয়া আবদুর রহমানকে কাবুলের তৎকালীন আমীর আবদুর রহমান (আমীর হাবিবুল্লাহ খানের পিতা) এর নির্দেশে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে শহীদ করা হয়।
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর রচিত "তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন" শিরোনাম পুস্তকে স্বীয় সত্যতার দলিল প্রমাণসহ উপরোল্লিখিত দু'জন মহান ব্যক্তির শাহাদাতের গভীর বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে

তাঁর জামাতকে কিছু উপদেশও প্রদান করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এই পুস্তকে মৌলভী শহীদ আবদুল লতিফ সাহেবের ইমানের দৃঢ়চিত্ততা সম্পর্কে লেখেন :

"নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো, যেভাবে তিনি আমার সত্যায়নের পথে মৃত্যুকে গ্রহণ করেন, এই ধরনের মৃত্যু ইসলামের তেরশত বৎসরের ইতিহাসে সাহাবাগণের (রা.) উদাহরণ ব্যতীত অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। অতএব নিঃসন্দেহে এভাবে তাঁর মৃত্যুবরণ করা এবং আমার সত্যায়নে নিজ প্রাণ খোদাতায়ালার কাছে সমর্পন করা আমার সত্যতার এক অতি মহান নিদর্শন। কিন্তু এটা তাদের জন্য যাদের বুদ্ধি জ্ঞান আছে।"

'আলামতে মুকাররাবীন' (নৈকট্য-প্রাপ্তগণের চিহ্নাবলী) সম্বলিত আরবি অংশ ও একটি ফারসি কবিতাসহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর "তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন" পুস্তকটি উর্দু ভাষায় রচিত। উর্দু পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব এবং পুস্তকের ফারসি কবিতাটি অনুবাদ করেছেন মৌলভী চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেব। উল্লেখ্য, অনিবার্য কারণে পুস্তকের আরবি অংশটির বঙ্গানুবাদ করা হয়নি। অনুদিত পুস্তকটি সম্পাদনা করেছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর সদর মুরব্বী মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব এবং এ কাজে তাঁকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন জনাব মুহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব। অনুদিত পুস্তকটির প্রুফ রিডিং এর ক্ষেত্রেও জনাব মুহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব অক্লান্তপরিশ্রম করেছেন। এই পুস্তকের অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার দরবারে বিনীত দোয়া করছি। আরো দোয়া করি, আমরাও যেন আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভের মহান উদ্দেশ্যে এই সাহসী প্রেমিক বান্দা হযরত সাহেবযাদা মৌলভী আবদুল লতিফ শহীদ (রা.)-এর ন্যায় আল্লাহতায়ালার পথে নিজেদের উৎসর্গ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোন যুগ-ইমামকে চিনতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আমীন।

**ডা. আবদুস সামাদ খান চৌধুরী**
সদর, মজলিসে আনসারুল্লাহ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তারিখ : ২০-১-৯২ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রথম উর্দু সংস্করণের ভূমিকার বঙ্গানুবাদ

الحمد لله والمنة (সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র) যে, এই মূল্যবান পুস্তিকাটিতে জ্ঞানের আকর কাবুলের শীর্ষ আলেম এবং আফগানিস্তানের বুযুর্গ-শিরোমণি এবং খোসতের মহান রইস মৌলভী মুহাম্মদ আবদুল লতিফ সাহেব মরহুমের শাহাদাতের বিবরণ এবং তাঁর যোগ্য শিষ্য মিয়া আবদুর রহমানের শহীদ হওয়ার বৃত্তান্তউল্লিখিত হয়েছে–যা আলামতে মুকাররাবীন (নৈকট্য-প্রাপ্তগণের চিহ্নাবলী) সম্বলিত আরবি অংশসহ সংকলিত হয়ে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হয়েছে; অর্থাৎ, তায্‌কেরাতুশ্‌ শাহাদাতাইন। পুস্তিকাটি যিয়াউল ইসলাম প্রেস, কাদিয়ান, প্রেসের মালিক হাকীম মৌলভী ফযলুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে অক্টোবর মাসে ছেপে প্রকাশ করা হল।

# লেখক পরিচিতি

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তপবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্তধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের উপর নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের ভাগ্যের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ  প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অসংখ্য লেখা (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্তধর্ম এবং একমাত্র এর বিশ্বাসসমূহকে অবলম্বনের মাধ্যমেই কেবল মানবকূল তার সৃষ্টিকর্তা–প্রকৃত খোদার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কুরআন-এর শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের প্রচারিত রীতি-নীতিই কেবল মানব জাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেনঃ কুরআন, বাইবেল ও হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহতায়ালা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে একত্রিত হওয়ার জন্য বয়াত গ্রহণ করা শুরু করেন–যা এখন বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল-এর মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র (আ.) প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্‌দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয় এবং তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তখলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বে পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ খামেস বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দান করছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর প্রপৌত্র হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

# বিষয়সূচী

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

# তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন

এই যুগে যদিও আকাশের নীচে সর্ব প্রকারের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবুও এখন আমি যে অত্যাচারের বিবরণ দিব তা এরূপ একটি মর্মান্তিক ঘটনা, যা হৃদয়কে আন্দোলিত করে এবং দেহকে প্রকম্পিত করে তোলে।

এই ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়ার পূর্বে একথা বর্ণনা করা প্রয়োজন, খোদাতায়ালা বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে এবং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও গোমরাহিতে পরিপূর্ণ দেখে আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। এ যুগেও এরূপ ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি এই আদেশের অনুবর্তিতায় জনগণকে লিখিত বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাতে থাকলাম, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার পক্ষ হতে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যাঁর আগমন করার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি; যাতে ঐ ইমান– যা পৃথিবী হতে উঠে গেছে তাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই কৃপার আকর্ষণে জগদ্বাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদাভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করি এবং তাদের বিশ্বাসগত ও আমল সংক্রান্তভুল-ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করি।

এরপর যখন কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল তখন খোদা ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে প্রকাশ করলেন, ঐ মসীহ–যিনি আদি হতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং ঐ শেষ মাহদী–যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং গোমরাহি বিস্তার লাভ করার যুগে সরাসরি খোদার কাছ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হবেন এবং ঐ ঐশী খাদ্য-সম্ভার নবরূপে মানবজাতির কাছে

উপস্থাপন করবেন, তিনি খোদার বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত হয়েছেন। আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর শুভ সংবাদ দান করেছেন, সেই ব্যক্তি আমিই। এই ব্যাপারে আল্লাহর বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সম্ভাষণ এত সুস্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যে, এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকটি ঐশী বাণী লৌহ-শলাকার ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছিল এবং এ সকল ঐশী বাক্যালাপ এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এইগুলি দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হচ্ছিল। এর ধারাবাহিকতা, বিপুলতা ও অলৌকিক শক্তির নিদর্শন আমাকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে, এইগুলি ঐ এক-অদ্বিতীয় খোদার কালাম, যাঁর কালাম কুরআন শরিফ। এখানে আমি তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম নিচ্ছি না। তওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃতি সৃষ্টিকারীদের হাতে এতখানি বিকৃত হয়েছে, এখন এগুলিকে খোদার কালাম বলা যায় না। মোট কথা, খোদার ঐ ওহী–যা আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তা এরূপ প্রত্যয়পূর্ণ ও সুনিশ্চিত, এর মাধ্যমে আমি নিজ খোদাকে লাভ করেছি। এই ওহী না কেবলমাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হাক্কুল ইয়াকিন' (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত বিশ্বাস) এর মর্যাদায় পৌঁছেছে বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদাতায়ালার কালাম কুরআন শরীফের সাথে যাচাই করে দেখা হল, তখন এটি কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য বলে প্রমাণ হল এবং এর সত্যায়নের জন্য স্বর্গীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে।

যেভাবে একথা লিপিবদ্ধ ছিল, এই মাহদীর যুগে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে, সেভাবে এই দিনগুলিতে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়েছে। যেমন কুরআন শরিফে লিপিবদ্ধ আছে এবং পূর্বের নবীগণও এই সংবাদ দিয়েছেন, এই দিনগুলিতে মহামারী ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবে এবং এমন হবে যে, কোন গ্রাম ও শহর ঐ মহামারী হতে মুক্ত থাকবে না। সেভাবে পাঞ্জাবে এই সময় ব্যাপক আকারে প্লেগেরও প্রাদুর্ভাব হয়েছে। বস্তুত এরূপই হয়েছে এবং হচ্ছে। যখন এই দেশে প্লেগের নাম নিশানা ছিল না, তখন খোদা আমাকে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ২২ বৎসর পূর্বে এটা দেখা দেয়ার সংবাদ প্রদান করেছেন। এরপর এ-বিষয়ে আমার কাছে বারিধারার ন্যায় ইলহাম হয়েছে। বস্তুত নিম্নবর্ণিত ওহীতে খোদা আমাকে এভাবে সম্বোধন করে বলেন (এই ওহী আরবি ভাষায় হয়েছিল-অনুবাদক) :

আরবি ওহীর অনুবাদ :- 'খোদার আদেশ আসছে। অতএব তোমরা ত্বরা করো না। এটি শুভ সংবাদ যা আদিকাল থেকে নবীগণ প্রাপ্ত হচ্ছেন। খোদা তার সাথে আছেন, যিনি 'তাকওয়া' (খোদা-ভীতি) অবলম্বন করেন। অর্থাৎ–শিষ্টাচার, লজ্জা এবং খোদা-ভীতির অনুসরণে তিনি ঐ সকল কল্পিত পথকেও পরিত্যাগ করেন যার মধ্যে পাপ ও অকৃতজ্ঞতার ধারণা থাকতে পারে। তিনি নির্ভীকভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না, বরং তিনি ভয়-ভীতির সাথে কোন কাজ করার ও কথা বলার সংকল্প করেন। খোদা তাদের সাথে আছেন যারা তাঁর সাথে অকৃত্রিম আচরণ করেন এবং তাঁর বান্দাগণের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন। তিনি শক্তিমান ও বিজয়ী। তিনি সর্ব কিছুর উপর বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। যখন তিনি কোন কিছু চান, তিনি বলেন, 'হও' তখন তা হয়ে যায়। তোমরা কি আমার কাছে থেকে পলায়ন করতে পার?

আমরা অপরাধীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব। বলা হয়, এতে কেবল মানুষের কথা এবং এ সকল বিষয়ে অন্যরা এই ব্যক্তিকে সাহায্য করেছে। এই ব্যক্তিতো অজ্ঞ বা উম্মাদ। তাদের বলে দাও, যদি তোমরা খোদাকে বন্ধু বলে জান, তাহলে আস এবং আমার আজ্ঞানুবর্তিতা কর, যাতে খোদাও তোমাদের বন্ধু বলে জানেন। যারা তোমার প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করে, আমরা তাদের জন্য যথেষ্ট। আমি ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করব, যে তোমাকে লাঞ্ছিত করতে মনস্থ করেছে এবং আমি ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করব, যে তোমাকে সাহায্য করতে চায়। যে আমার কাছে রয়েছে, আমি তার। আমার রাসুল ভয় পায় না। যখন খোদার সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তোমার প্রভুর বাক্য পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন বলা হবে যে, এটি তা-ই যার জন্য তোমরা ত্বরা করছিলে। যখন তাদের বলা হয় পৃথিবীতে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাতো সংস্কার করছি। সাবধান তখন তারা বলে, আমরাতো সংস্কার করছি। সাবধান হও! এরাই বিভেদ সৃষ্টিকারী। এরা তোমাকে হাসি-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং বিদ্রুপ করে বলে এই কি সেই ব্যক্তি যাকে খোদা প্রেরণ করেছেন? এতো তাদের কথা। কিন্তু আসল কথা হলো, আমরা তাদের কাছে সত্য উপস্থাপন করেছি। সুতরাং তারা সত্য গ্রহণ করতে ঘৃণা বোধ করছে এবং যারা যুলুম করেছে তারা অতিসত্বর জানতে পারবে, তাদের কোন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। খোদার উপর যে সকল অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে, তিনি ঐগুলি হতে পবিত্র ও ঐগুলির উর্ধ্বে। তারা বলে, তুমি খোদার

পক্ষ হতে প্রেরিত নও। তাদের বলে দাও, আমার কাছে খোদার সাক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে। এরপরও কি তোমরা ইমান আনবে না? তুমি আমার দরগাহে সম্মানিত এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য বেছে নিয়েছি। যখন তুমি কারও উপর অসন্তুষ্ট হও, তখন আমি তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি এবং যে সকল বস্তুকে তুমি ভালবাস, আমিও ঐ সকল বস্তুকে ভালবাসি। খোদা স্বীয় আরশ হতে তোমার প্রশংসা করছেন। খোদা তোমার প্রশংসা করছেন এবং তোমার দিকে আগমন করছেন। তুমি আমার কাছে ঐ মর্যাদা লাভ করছ, যা জগদ্বাসী অবগত নয়। তুমি আমার কাছে এরূপ, যেরূপ আমার তওহীদ ও একত্ব। তুমি আমার পানি হতে সৃষ্ট এবং তারা কাপুরুষতা হতে। ঐ খোদার জন্য প্রশংসা, যিনি তোমাকে মসীহ ইবনে মরিয়ম করেছেন এবং তোমাকে ঐ সকল বিষয় শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। লোকেরা বলল, ঐ মর্যাদা কোথা হতে এবং কিভাবে লাভ করলে? তাদের বলে দাও, আমার খোদা বিস্ময়কর খোদা! তাঁর আশীষকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না যে, তিনি এরূপ কেন করলেন । কিন্তু লোকেরা তাদের নিজ-নিজ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হয়ে থাকে। তোমার প্রভু যা চান, তা করেন। তিনি এই আদমকে সৃষ্টি করে বুযুর্গী দান করলেন। আমি ঐ যুগে ইচ্ছা করলাম, আমার একজন খলীফা কায়েম করব। অতএব আমি এই আদমকে সৃষ্টি করলাম। কিন্তু লোকেরা বলল তুমি কি এরূপ ব্যক্তিকে স্বীয় খলীফা মনোনীত করছ, যে পৃথিবীতে ফাসাদ করবে, অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি করবে। তখন খোদা তাদের বললেন যে বিষয় আমি অবগত আছি সে বিষয়ে তোমরা অবগত নও। তারা আরও বলে, এটি একটি সাজানো ব্যাপার। বল, খোদা আছেন, যিনি এই সিলসিলা কায়েম করেছেন। অতঃপর এই কথা বলে তাদের নিজেদের আমোদ-স্ফূর্তি ও খেলাধূলায় (মত্ত হতে) ছেড়ে দাও। আমরা সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যের প্রয়োজন অনুযায়ী সে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা তোমাকে সমগ্র জগতের একটি সার্বজনীন রহমতে স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

হে আমার আহমদ! তুমি আমার কাম্য এবং তুমি আমার সাথে রয়েছ। তোমার গুঢ়তত্ত্ব আমার গুঢ়তত্ত্ব! তোমার মহিমা অদ্ভুত এবং পুরস্কার সমাগত! আমি তোমাকে জ্যোতির্ময় করেছি এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। তোমার উপর এরূপ একটি যুগও আসবে, যেরূপ মুসার উপর এসেছিল। তুমি ঐ সকল লোক সম্বন্ধে আমার কাছে সুপারিশ করো না, যারা অত্যাচারী। কেননা তাদের

নিমজ্জিত করা হবে। এই সকল লোক ষড়যন্ত্র করবে আর খোদাও তাদের বিরুদ্ধে কৌশল ও ক্রীড়া পরিচালনাকারী। তিনি দয়ালু। তিনি তোমার সম্মুখে চলছেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে শত্রু মনে করেন, যে তোমার সাথে  শত্রুতা করে। তিনি অচিরেই তোমাকে ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আমরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হব এবং আমরা একে চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করে আনছি, যাতে তুমি এই জাতিকে সতর্ক কর, যাদের পূর্ব-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি এবং যাতে অপরাধীদের জন্য প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়। বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট এবং আমি সর্ব প্রথম মুমিন। বল, আমার উপর এই ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে যে, তোমাদের খোদা এক খোদা এবং সকল কল্যাণ কুরআনে নিহিত রয়েছে! এর অন্তর্নিহিত সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত ঐ সকল লোকই পৌঁছতে পারে, যাদের পবিত্র করা হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা এরপর অর্থাৎ, একে বাদ দিয়ে কোন হাদিসের উপর ইমান আনবে? এই সকল লোক কামনা করছে তারা কিছু এরূপ প্রচেষ্টা করবে, যাতে তোমার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু খোদার ইচ্ছা তো এটিই চান যে, তোমার উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাবেন। আর খোদা এরূপ নন পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করে না দেখিয়ে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। খোদা সেই খোদা, যিনি নিজ রাসুলকে অর্থাৎ এই অধমকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন; এবং খোদার প্রতিশ্রুতি একদিন পূর্ণ হতোই! খোদার প্রতিশ্রুতি এসেছে এবং এক পা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন। খোদা তোমাকে শত্রুদের হাত হতে রক্ষা করবেন এবং ঐ ব্যক্তির উপর আক্রমণ করবেন, যে যুলুমের পথ অবলম্বন করে তোমার উপর হামলা করবে। তাঁর ক্রোধ পৃথিবীর উপর নেমে আসছে, কেননা লোকেরা পাপ কার্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে মাঠে নামছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। রোগ-ব্যাধি দেশে বিস্তৃত করা হবে এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রাণ হরণ করা হবে। এই আদেশ আকাশে গৃহীত হয়েছে। এটি ঐ খোদার আদেশ, যিনি বিজয়ী ও মহা মর্যাদাশালী। জাতির উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, খোদা তার পরিবর্তন করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সকল লোক নিজের হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন না করে। তিনি এই কাদিয়ান গ্রামকে কিছুটা পরীক্ষার পর নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন। * আজ খোদা ব্যতীত কেউ রক্ষাকারী নাই। আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী তরী নির্মাণ কর।

ঐ সর্বশক্তিমান খোদা তোমার সাথে  ও তোমার লোকদের সাথে  রয়েছেন। তোমার

গৃহাভ্যন্তরে যা রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে আমি রক্ষা করব; কিন্তু তারা ব্যতীত যারা আমার বিরুদ্ধে অহঙ্কারের সাথে অবাধ্য এবং দাম্ভিক, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করে না! বিশেষভাবে আমার নিরাপত্তাবলয় সর্বদাই তোমার সাথে থাকবে। দয়ালু খোদার পক্ষ হতে শান্তি। তোমার উপর শান্তি। তুমি পবিত্রাত্মা এবং হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। আমি রাসুলের সাথে দণ্ডায়মান হব এবং ইফতার করব এবং রোযাও রাখব  এবং তাকে তিরস্কার করব, যে তিরস্কার করে এবং তোমাকে ঐ পুরস্কার দিব, যা চিরকাল থাকবে এবং আমার বিকাশের জ্যোতি তোমার মধ্যে স্থাপন করব। আমি এই পৃথিবী হতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথক হব না, অর্থাৎ আমার আযাবের বিকাশে পার্থক্য হবে না। আমি বজ্র এবং আমি অযাচিত দাতা। আমি দয়ালু এবং ক্ষমাশীল।’

* ‘আওয়া’ শব্দটি আরবি ভাষায় এরূপ স্থলে ব্যবহার করা হয় যখন কোন ব্যক্তিকে কিছুটা দুঃখ-কষ্ট অথবা পরীক্ষার পর নিজের আশ্রয়ে নেয়া হয় এবং দুঃখ-কষ্টের আধিক্য ও প্রাণ হরণ করা হতে বাঁচানো হয়। যেমন- আল্লাহ্তায়ালা বলেন আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া (অর্থাৎ, তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দান করেননি?- সুরা যোহা: ৮, অনুবাদক)। অনুরূপভাবে সমগ্র কুরআন শরিফে ‘আওয়া’ এবং আওয়া এরূপ স্থলেই ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতিকে কিছুটা কষ্টের পর পুনরায় আরাম দেয়া হয়েছে।

# দু'টি শাহাদাতের বিবরণ

এই দিনগুলিতেই যখন অবিরাম ধারায় খোদার ওহী আমার উপর অবতীর্ণ হল এবং অত্যন্তপ্রদীপ্ত ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশিত হল এবং আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবি দলিল-প্রমাণসহ মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হল, তখন ঘটনাক্রমে খোসত অঞ্চলের আখওয়ান্দযাদা মৌলভী আবদুল লতিফ নামে একজন বুযুর্গের কাছে পর্যন্তআমার পুস্তকাদি পৌঁছে। ঐ সকল দলিল-প্রমাণ, যা আমি পূর্ববর্তী পুস্তকসমূহের উদ্ধৃতি ও যুক্তি এবং ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে নিজের পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ করছিলাম, ঐ সকল দলিল-প্রমাণাদি তাঁর হৃদয়ে প্রতিভাত হল। যেহেতু বুযুর্গ নেহায়েত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, খোদাভীরু ও মুত্তাকী ছিলেন, সেহেতু তার হৃদয়ে এসকল দলিল-প্রমাণের গভীর প্রভাব পড়ল এবং এই দাবির সত্যায়নে তাঁর কোন কষ্ট হল না। তার পবিত্র বিবেক স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকার করল যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মনোনীত এবং এই দাবি সঠিক। তখন তিনি আমার বই পুস্তকগুলি অত্যন্তঅনুরাগের সাথে পাড়তে শুরু করেন এবং তার অতি স্বচ্ছ ও সত্য গ্রহণেচ্ছু আত্মা আমার প্রতি আকৃষ্ট হল। এমনকি আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে দূরে বসে থাকা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ল। অবশেষে এই শক্তিশালী আকর্ষণ ও অনুরাগ এবং আন্তরিকতার ফল এই দাঁড়াল যে, তিনি কাবুল সরকারের কাছে থেকে অনুমতি লাভের প্রত্যাশায় হজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন এবং এই সফরের ব্যাপারে কাবুলের আমীরের কাছে আবেদন করেন। যেহেতু তিনি কাবুলের আমীরের দৃষ্টিতে একজন অতি সম্মানিত আলেম ছিলেন এবং তাকে কেবলমাত্র অনুমতিই দেয়া হল না, বরং সাহায্যস্বরূপ কিছু অর্থও প্রদান করা হল। সুতরাং তিনি অনুমতি লাভ করে কাদিয়ানে পৌঁছেন। ঐ খোদার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, যখন আমার সাথে তার সাক্ষাত হল আমি তাকে আমার আনুগত্য এবং আমার দাবির সত্যায়নে এত আত্মবিলীনকারী দেখলাম যে, এর চাইতে বেশি (আত্মবিলীনকারী হওয়া) মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেভাবে একটি শিশি আতরে পরিপূর্ণ থাকে, সেরকম আমি তাকে আমার ভালাবাসায় পরিপূর্ণ দেখলাম তার চেহারার মতই তার হৃদয় আমার কাছে আলোকময় মনে হচ্ছিল। এই মরহুম বুযুর্গের মধ্যে

অত্যন্তঈর্ষাযোগ্য এই গুণ ছিল যে, তিনি প্রকৃতপক্ষ ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করতেন। তিনি বস্তুত ঐ সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা খোদাকে ভয় করে নিজেদের তাকওয়া ও খোদার আজ্ঞানুবর্তিতাকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে থাকেন এবং খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ও তাঁর প্রীতি লাভ করার জন্য নিজেদের জীবন, অর্থ-সম্পদ ও সম্মানকে মূল্যহীন মনেকরে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। তার ইমানের শক্তি এতখানি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, আমি যদি তাকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর পর্বতের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে আমি ভয় করছি যে, আমার এই তুলনা ক্ষুদ্র না হয়ে যায়। অধিকাংশ লোক বয়াত করা সত্ত্বেও এবং আমার দাবির সত্যায়ন করা সত্ত্বেও পার্থিব বিষয়কে ধর্মের উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষাক্ত বীজ হতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ লাভ করে না। বরং তাদের মধ্যে কিছু সংমিশ্রণ অবশিষ্ট থেকে যায় এবং জীবন সম্বন্ধেই হোক, ইজ্জত সম্বন্ধেই হোক, একটি প্রচ্ছন্ন কৃপণতা তাদের সম্পূর্ণ নফ্সের মধ্যে দেখা যায় হয়। এই কারণে তাদের সম্বন্ধে সর্বদা আমার মনের অবস্থা এরূপ থাকে যে, আমি সব সময় কোন ধর্মীয় খেদমত উপস্থাপন করার সময়ে ভয় করতে থাকি যে, তারা পরীক্ষায় না পড়ে যায় এবং এই খেদমতকে নিজেদের উপর একটি বোঝা মনে করে তাদের বয়াতকে বিদায় না জানিয়ে দেয়। কিন্তু আমি কোন ভাষায় এই মরহুম বুযুর্গের প্রশংসা করব, যিনি স্বীয় জান, মাল ও ইজ্জতকে আমার আনুগত্যে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলেছেন, যেভাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। অধিকাংশ লোককে আমি দেখি তাদের প্রথম ও শেষ এক রকম থাকে না এবং সামান্যতম হোঁচট বা শয়তানী কুপ্ররোচণা, বা কুসঙ্গের দরুণ তারা পদস্খলিত হয়ে যায়। কিন্তু এই মরহুম বীর পুরুষের অবিচল দৃঢ়তার কথা আমি কোন ভাষায় বর্ণনা করব যে, তিনি বিশ্বাসের জ্যোতিতে প্রতিমুহূর্তে উন্নতি করতে থাকেন। যখন তিনি আমার কাছে পৌঁছেন তখন তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোন দলিল-প্রমাণ দ্বারা আপনি আমাকে সনাক্ত করেছেন? তখন তিনি বলেন সর্বপ্রথম বিষয় কুরআন, যা আমাকে আপনার প্রতি পথ-নির্দেশ করেছে। তিনি আরও বলেন, আমি এরূপ এক স্বভাবের ব্যক্তি ছিলাম পূর্ব হতে সিদ্ধান্তেউপনীত হয়েছিলাম আমরা যে যুগে আছি, এই যুগের অধিকাংশ মুসলমান ইসলামী আধ্যাত্মিকতা হতে বহু দূরে সরে পড়ছে। তারা মুখে বলে আমরা ইমান এনেছি। কিন্তু তাদের হৃদয় মুমিন নয় এবং তাদের কথা ও কাজ বিদাত, শিরক ও বিভিন্ন প্রকারের পাপে পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবেই

বাইরের আক্রমণও চূড়ান্তপর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অধিকাংশ হৃদয় অন্ধকার পর্দার মধ্যে এরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে, যেন মৃত। ঐ দ্বীন ও তাকওয়া, যা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এনেছিলেন, যাঁর শিক্ষা সাহাবা (রা.)-গণকে দেয়া হয়েছিল এবং যে সত্যবাদিতা, বিশ্বাস ও ইমান এই পবিত্র জামাত লাভ করেছিল, ঐগুলি এখন গাফিলতির দরুণ নিঃসন্দেহে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং নেই বললেই চলে। ভাবেই আমি দেখছিলাম ইসলাম এক মৃতের অবস্থায় রয়েছে এবং এখন অদৃশ্যের অন্তরাল হতে আল্লাহ্‌র মনোনীত কোন ধর্ম সংস্কারের সৃষ্টি হওয়ার সময় এসে গেছে। বরং আমি দিনের পর দিন অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম সময় সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। এমনি সময়ে এই আওয়াজ আমার কানে পৌঁছল এক ব্যক্তি পাঞ্জাব অঞ্চলের কাদিয়ানে মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবি করেছেন এবং আমি একান্তভাবে চেষ্টা করে আপনার রচিত কয়েক খানা পুস্তক সংগ্রহ করলাম এবং ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে ঐগুলি যাচাই করে দেখলাম। তখন ঐগুলির প্রত্যেকটি কথা কুরআন শরীফ কর্তৃক সত্যায়িত দেখতে পেলাম। অতএব যে বিষয়টি আমাকে প্রথম এই দিকে ধাবিত করেছিল, তা হল এই যে, আমি দেখলাম একদিকে তো কুরআন শরীফ বর্ণনা করছে যে, ইসা আলাইহিস সালাম মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তিনি ফিরে আসবেন না এবং অন্যদিকে তা মুসায়ী সিলসিলার বিপরীতে এই উম্মতকে প্রতিশ্রুতি দান করছে যে, তা এই উম্মতের বিপদ ও গোমরাহীর যুগে এ সকল খলীফার রঙে খলীফা প্রেরণ করতে থাকবে, যাদের মুসায়ী সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করতে ও বহাল রাখতে করা হয়েছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে যেহেতু হযরত ইসা আলাইহিস সালাম একজন এরূপ খলীফা ছিলেন, যিনি মুসায়ী সিলসিলার শেষ যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেসাথে তিনি এরূপ খলীফা ছিলেন যিনি যুদ্ধ করার জন্য মনোনীত হননি। কাজেই খোদাতায়ালার কালাম হতে নিশ্চয়ই এটি বুঝা যাচ্ছে তাঁর রঙেও এই উম্মতে শেষ যুগে কেউ জন্মগ্রহণ করবেন। অনুরূপভাবে অনেক তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা তার মুখ হতে আমি শুনলাম। এগুলির কাছে কোন কোনটি আমার স্মরণ আছে এবং কোন কোনটি আমি ভুলে গেছি। তিনি কয়েক মাস যাবত আমার কাছে অবস্থান করেন। আমার কথা শুনতে তিনি এতখানি আগ্রহী ছিলেন যে, আমার কথাকে তিনি হজের উপর প্রাধান্য দিলেন এবং বললেন আমি এই জ্ঞানের মুখাপেক্ষী ছিলাম যদ্বারা ইমান শক্তিশালী হয় এবং জ্ঞান আমলের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

অতএব আমি তাকে উৎসাহ দেখে আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল নিজের

তত্ত্বজ্ঞান তাঁর হৃদয়ে প্রবিষ্ট করলাম এবং এভাবে তাঁকে বুঝালাম, দেখ একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ জাল্লাশানুহু কুরআন শরিফে বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۵ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

(সুরা মুয্যাম্মেল : ১২)

অর্থ-একজন রাসুল যিনি তোমাদের উপর সাক্ষী রয়েছেন। অর্থাৎ, এই কথার সাক্ষী যে, তোমরা কত মন্দ অবস্থায় রয়েছ, আমরা তাঁকে তোমাদের কাছে ঐ রাসুলের মতই প্রেরণ করেছি যাঁকে ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং এই আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত মুসার (আ.) সদৃশ প্রমাণিত করেছেন। অতঃপর তিনি সুরা নুরে মুহাম্মদী খিলাফতের ধারাকে মুসায়ী খিলাফতের ধারার সদৃশ বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং অন্ততপক্ষে সাদৃশ্য প্রমাণ করার জন্য উভয় ধারার প্রথম ও শেষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য থাকা জরুরী। অর্থাৎ, এই ধারার প্রারম্ভে হযরত মুসার সদৃশ হওয়া এবং এই ধারার পরিশেষে হযরত ইসার সদৃশ হওয়া জরুরী। আমাদের বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ এই কথাতো স্বীকার করেন যে, ইসলাম ধর্মের ধারা হযরত মুসা (আ.) এর ধারার সাদৃশ্যে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তারা সরাসরিভাবে হঠকারিতা করে এই কথা গ্রহণ করেন না যে, ইসা সাদৃশ্যে এই ধারার পরিসমাপ্তি হবে এবং এই ধারায় তারা পরিকল্পিতভাবে কুরআন শরীফকে পরিত্যাগ করেন। একথা কি সত্য নয়, কুরআন করীম আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত মুসার সদৃশ সাব্যস্ত করেছে? এটি কি সত্য নয় যে, কুরআন করীম আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু হযরত মুসার সদৃশ সাব্যস্ত করে নাই, বরং كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
(সুরা নুরঃ ৫৬)

আয়াতে মুহাম্মদী খিলাফতের সমগ্র ধারাকে মুসায়ী খিলাফতের ধারার সদৃশ সাব্যস্ত করেছেন? এমতাবস্থায় নিশ্চিত ও অনিবার্যভাবে আবশ্যক যে, ইসলামী খিলাফতের ধারার শেষ পর্যায়ে একজন ইসা সদৃশ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন যেহেতু প্রথম ও শেষের সাদৃশ্য প্রমাণিত হলে সমস্ত ধারার সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়ে যায়, এই জন্য খোদাতায়ালার পবিত্র নবীগণের কিতাবসমূহে বহুস্থানে এই দু'টি সাদৃশ্যের উপরই জোর দেয়া হয়েছে। বরং প্রথম এবং শেষের শত্রুদের মধ্যেও সাদৃশ্য প্রমাণ করা হয়েছে যেমন আবু জাহলকে ফেরাউনের সাথে সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে এবং শেষে মসীহের বিরুদ্ধবাদীদেরকে 'মাগযুবি

আলাইহিম’ ইহুদীদের সাথে (অর্থাৎ ক্রোধভাজন ইহুদীদের সাথে) সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(সুরা নুরঃ ৫৬)

আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই উম্মতের শেষ খলীফা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এরূপ যুগে আগমন করবেন, যেই যুগের মেয়াদকাল ঐ যুগের মত হবে যেভাবে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করে ছিলেন। কেননা ‘কামা’ শব্দটি যে সাদৃশ্যের দাবি রাখে, তাতে যুগের সাদৃশ্যও অন্তর্ভূক্ত। ইহুদীদের সকল ফিরকা এই বিষয়ে একমত, মরিয়ম পুত্র ইসা যে যুগে নবুওয়াতের দাবি করেন, ঐ যুগ হযরত মুসা (আ.) হতে চর্তুদশ শতাব্দীতে ছিল। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রটেস্ট্যান্টদের বক্তব্য ইহুদীদের সর্বসম্মত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কোন গুরুত্ব বহন করে না। যদি তাদের মতামত মেনেও নেয়া হয়, তারপরও এরূপ সামান্য পার্থক্যের জন্য সাদৃশ্যে কোন পার্থক্য হয় না। বরং সাদৃশ্য একটি সামান্য পার্থক্যের দাবি জানায়। এভাবেই কুরআন শরীফের আলোকে মুহাম্মদী সিলসিলা মুসায়ী সিলসিলার সাথে প্রত্যেকটি পুণ্যে ও পাপে সাদৃশ্যযুক্ত। এরই প্রতি এই আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এক জায়গায় ইহুদীদের ক্ষেত্রে লিখা হয়েছে। فينظر كيف تعملون

(সুরা আলে ইমরান : ১৩০)

এবং অন্যত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

(সুরা ইউনুসঃ ১৫)

এই উভয় আয়াতের অর্থ হল, খোদা তোমাদের খিলাফত ও শাসনক্ষমতা দান করে দেখাবেন, তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক কিনা। এই আয়াতগুলিতে ইহুদীদের জন্য যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, ঐ শব্দগুলিই মুসলমানদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ একই আয়াতের অধীনে উভয়কে রাখা হয়েছে। অতএব এই আয়াতগুলির চাইতে অধিক এই কথার আর কি প্রমাণ থাকতে পারে, খোদা কোন-কোন মুসলমানকে ইহুদী সাব্যস্ত করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন, ইহুদী আলেমরা যে সকল পাপে লিপ্ত ছিল এই উম্মতের আলেমরাও ঠিক ঐ সকল পাপেই লিপ্ত হবে এবং এই বিষয়ের প্রতিই غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

(সুরা ফাতেহা)

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এই আয়াতের সকল তফসীরকারক একমত যে, 'মাগযুবি 'আলায়হিম' বলতে ঐ সকল ইহুদীদের বুঝায় যাদের উপর হযরত ইসা আলায়হেস সালামকে অস্বীকার করার দরুণ গযব অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সহী হাদিসে মাগযুবি 'আলায়হিম' বলতে ঐ সকল ইহুদীদের বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীতে খোদার গযবের পাত্র হয়েছিল। কুরআন শরীফ এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছে ইহুদীদের 'মাগযুবি আলায়হিম' আখ্যায়িত করার জন্যও হযরত ইসা আলাইহিস সালামের মুখ হতে অভিসম্পাত নিঃসৃত হয়েছিল। অতএব সুনিশ্চিত ও অনিবার্যভাবে 'মাগযুবি আলায়হিম' বলতে ঐ সকল ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল। এখন খোদাতায়ালার এই দোয়া শিখানো যে, 'হে খোদা, আমরা যেন ঐ সকল ইহুদীতে পরিণত না হই, যারা ইসা (আ.)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল'–এটি সুস্পষ্টরূপে বলে দিচ্ছে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতেও একজন ইসা জন্ম গ্রহণ করবেন। নতুবা এই দোয়ার কি প্রয়োজন ছিল? এতদ্ব্যতীত যখন উপরেল্লেখিত আয়াতে প্রমাণিত হয় কোন এক যুগে কোন কোন মুসলমান আলেম সম্পূর্ণরূপে ইহুদী আলেমদের সদৃশ হয়ে যাবে এবং ইহুদীতে পরিণত হবে, তখন এই কথা বলা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক যে, 'এই ইহুদীদের সংস্কারের জন্য ইস্রাইলী ইসা (আ.) আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন।' কেননা, প্রথমত বাহির থেকে একজন নবীর আগমনে খত্মে নবুওয়তের মোহর ভেঙে যায়। কিন্তু কুরআন শরিফ দ্ব্যর্থহীনভাবে আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'খাতামাল আম্বিয়া' (নবীগণের মোহর-অনুবাদক) আখ্যায়িত করেছে। তদুপরি কুরআন শরীফের আলোকে এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এই উম্মতের জন্য এর চেয়ে বেশি অবমাননাকর আর কিছু হতে পারে না যে, এই উম্মত তো ইহুদীতে পরিণত হবে, অথচ ইসা (আ.) উম্মতের বাহির হতে আগমন করবেন। যদি একথা সত্য হয় কোন এক যুগে এই উম্মতের অধিকাংশ আলেম ইহুদীতে পরিণত হবে, অর্থাৎ তাদের স্বভাব চরিত্র ইহুদীর মত হয়ে যাবে, তাহলে একথাও সত্য যে, এই ইহুদীদের সংস্কারের জন্য ইসা (আ.) বাহির হতে আগমন করবেন না; বরং কোন–কোন ব্যক্তির নাম ইহুদী রাখা হয়েছে। যেমনঃ 'গায়রিল মাগযুবি আলায়হিম' আয়াত হতে এটা প্রমাণিত না হতো, তাহলে উপরোল্লিখিত দোয়া কখনো শিখানো হতো না। যখন থেকে আদিকাল হতে পৃথিবীতে খোদাতায়ালার প্রেরিত কিতাবসমূহের মধ্যে তাঁর এই বাগধারাটিই রয়েছে যে, যখন কোন জাতিকে

একটি বিষয়ে নিষেধ করা হয় উদাহরণস্বরূপ, যখন বলা হয় তোমরা ব্যভিচার করো না বা চুরি করো না বা ইহুদীতে পরিণত হয়ো না, তখন উক্ত নিষেধের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও প্রচ্ছন্ন থাকে যে, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এসকল অপরাধে লিপ্ত হবে। পৃথিবীতে কেউ এরূপ দৃষ্টান্তদেখাতে পারবে না যে, খোদাতায়ালা একটি জামাত বা একটি জাতিকে কোন ঘৃণ্য কাজ করতে নিষেধ করার পর তাদের সকলেই উক্ত কাজ হতে বিরত রয়েছে। বরং নিশ্চয় তাদের কেউ-কেউ এই কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা তওরাতে ইহুদীদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তওরাতকে বিকৃত করো না; পক্ষান্তরে এই আদেশের ফলে অবস্থা এই দাঁড়াল যে, কোন-কোন ইহুদী তওরাতকে বিকৃত করল। কিন্তু কুরআন শরিফে খোদাতায়ালা মুসলমানদের কোথাও আদেশ দেননি যে, তোমরা কুরআনকে বিকৃত করো না; বরং একথা বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

অর্থাৎ, আমরাই কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর হিফাযত করব। (সুরা হিজর : ১০)। এ কারণেই কুরআন শরীফ বিকৃতি হতে রক্ষা পেয়েছে। আসল কথা, এটি খোদার নিশ্চিত এবং অনিবার্য ও চিরন্তন নিয়ম যে, খোদাতায়ালা যখন কোন কিতাবে কোন জাতিকে বা জামাতকে একটি মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন, বা পুণ্য কাজ করতে আদেশ দেন তখন তাঁর আদি জ্ঞানে এই কথা থাকে যে, কোন–কোন লোক তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণও করবে। অতএব সুরা ফাতেহায় খোদাতায়ালার এই কথা বলা যে, তোমরা দোয়া কর যেন তোমরা ঐ সকল ইহুদীতে পরিণত না হও যারা ইসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশ বিদ্ধ করতে চেয়েছিল যেজন্য পৃথিবীতেই তাদের উপর ঐশী গযব আঘাত হেনেছিল। এটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, খোদাতায়ালার জ্ঞানে এটি অবধারিত ছিল উম্মতের কোন–কোন লোক যারা উম্মতের উলামারূপে কথিত হবে তারা নিজেদের দুষ্টামী ও দুষ্কৃতির জন্য এবং যুগ-মসীহ্কে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করার দরুণ ইহুদীদের পোষাক পরিধান করবে। নতুবা একটি বৃথা দোয়া শিখানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। এটিতো বলাবাহুল্য, এই উম্মতের আলেমরা ঐ ধরনের ইহুদীতে পরিণত হতে পারে না যে, তারা ঐ ইসরাইল বংশ হতে হবে এবং তদুপরি ঐ মরিয়ম-পুত্র ইসা–যিনি দীর্ঘকাল এই ধরাধাম হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন তাঁকে তারা ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইবে। কেননা এই যুগে ঐ ইহুদীরাও ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যামান নাই

এবং ঐ ইসা (আ.)-ও বিদ্যমান নাই। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতে একটি ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, এই উম্মতে ইসা মসীহ (আ.)-এর রঙে শেষ যুগে এক ব্যক্তি প্রেরিত হবেন এবং তাঁর যুগের কোন-কোন ইসলামী আলেম ঐ সকল ইহুদী আলেমের ন্যায় তাঁকে কষ্ট ও গালমন্দ দিবে যারা ইসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট ও গালমন্দ দিত।

বরং সহীহ হাদিস হতে একথাই বুঝা যাচ্ছে ইহুদী হওয়ার অর্থ ইহুদীদের মন্দ চরিত্র ও বদ অভ্যাস ইসলামের আলেমগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাবে। যদিও বাহ্যত তারা মুসলমান হিসাবে কথিত হবে, কিন্তু তাদের হৃদয় বিকৃত হয়ে সেসব ইহুদীর রঙে রঙিন হয়ে যাবে, যারা হযরত ইসা আলায়হেস সালামকে কষ্ট দিয়ে ঐশী কোপগ্রস্থ হয়েছিল। সুতরাং যখন এই সকল লোক ইহুদী হবে যারা মুসলমান হিসাবে পরিচিত, তখন কি মৃত উম্মতের জন্য এটি অবমাননাকর হবে না যে, ইহুদী হওয়ার জন্যতো এদের নির্ধারিত করা হবে, কিন্তু যেই মসীহ এই ইহুদীদের সংশোধন করবেন তিনি অন্যজাতি হতে আগমন করবেন? এটিতো কুরআন শরীফের উদ্দেশ্যের সরাসরি বিপরীত। কুরআন শরীফ কেবলমাত্র মন্দের ক্ষেত্রে নয়, বরং প্রত্যেকটি উত্তম ও মন্দের ক্ষেত্রে মুহাম্মদী সিলসিলাকে মুসায়ী সিলসিলার সাথে তুলনা করেছে! এছাড়া 'গা্য়রিল মাগযুবি আলায়হিম' আয়াতের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকল লোক এজন্য ইহুদী বলে কথিত হবে তারা খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে, যিনি তাদের শুদ্ধির জন্য আগমন করবেন, তাঁকে তাচ্ছিল্যভরে অস্বীকার করবে, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করবে, তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হবে এবং নিজেদের প্রচন্ড ক্রোধাগ্নি তাঁর বিরুদ্ধাচরণে প্রজ্জ্বলিত করবে। এজন্য তারা আকাশে ঐ সকল ইহুদীদের ন্যায় 'মাগযুবি আলায়হিম' বলে গণ্য হবে-যারা হযরত ইসা আলাইহিস সালামের প্রত্যাখ্যানকারী ছিল। অবশেষে এই প্রত্যাখ্যানের পরিণাম এই হয়েছিল, ইহুদীদের মধ্যে ভয়ংকর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। অতঃপর রোমক সম্রাট টাইটাসের হাতে তারা পর্যুদস্ত হয়েছিল। সুতরাং 'গায়রিল মাগযুবি আলায়হিম' আয়াত হতে এটি সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতেই তাদের উপর ভয়াবহ গযব অবতীর্ণ হবে। কেননা পরকালের গযবে তো প্রত্যেক কাফির অংশীদার হবে এবং পরকালের দিক হতে সকল কাফির 'মাগযুবি আলায়হিম' (অর্থাৎ, কোপগ্রস্ত)। তাহলে কি কারণে খোদাতায়ালা এই আয়াতে বিশেষ করে এই সকল ইহুদীর নাম 'মাগযুবি আলায়হিম' রাখেছেন, যারা হযরত ইসা

(আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল, এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী ক্রুশে হত্যা করেছিল? অতএব মনে রাখতে হবে এই সকল ইহুদীকে 'মাগযুবি আলায়হিম' এর বৈশিষ্ট্য এজন্য দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতেই তাদের উপর ইলাহী গযব অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এর ভিত্তিতেই এই উম্মতকে সুরা ফাতিহায় দোয়া শিখানো হয়েছে যে, হে খোদা! এমনটি কর যাতে আমরা ইহুদীতে পরিণত হয়ে না যাই। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এর অর্থ এই ছিল যে, যখন এই উম্মতের মসীহ প্রেরিত হবেন তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐ ইহুদীও সৃষ্টি হয়ে যাবে, যাদের উপর এই পৃথিবীতেই খোদার গযব অবতীর্ণ হবে। সুতরাং দোয়ার অর্থ এই ছিল এটি অবধারিত যে, তোমাদের মধ্য হতেও একজন মসীহ জন্ম নিবেন এবং তাঁর বিরে ধিতায় ইহুদীও জন্ম হবে, যাদের উপর পৃথিবীতেই গযব অবতীর্ণ হবে। অতএব দোয়া করতে থাক, যাতে তোমরা এরূপ ইহুদীতে পরিণত হয়ে না যাও।

একথা মনে রাখার যোগ্য যে, এমনিতে তো প্রত্যেক কাফের পরকালে গযবের পাত্র হবে। কিন্তু এই স্থলে গযবের অর্থ ইহকালের গযব, অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য–যা পৃথিবীতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। ঐ সকল ইহুদী যারা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছিল এবং কুরআন করীমের সনদ দ্বারা তাঁর ভাষায় অভিশপ্ত বলে কথিত হয়েছিল, তারা ঐ সকল লোক যাদের উপর পৃথিবীতে গযব পতিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমত যারা অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল, তারা রোমক সম্রাট টাইটাসের হাতে কঠোর শাস্তির দরুন দেশ হতে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। অতএব 'গায়রিল মাগযুবি আলয়হিম' -এ এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীই নিহিত রয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ইহুদী বলে আখ্যায়িত হবে তারাও এক মসীহকে প্রত্যাখ্যান করবে, যিনি ঐ পূর্বের মসীহের রঙে আগমন করবেন। অর্থাৎ, তিনি জিহাদও করবেন না এবং তলোয়ারও ধারণ করবেন না। বরং পবিত্র শিক্ষা ও স্বর্গীয় নির্দেশাবলীর মাধ্যমে দ্বীনকে সম্প্রসারিত করবেন এবং এই শেষ মসীহের প্রত্যাখ্যানের পরেও পৃথিবীতে প্লেগ বিস্তৃত হবে এবং ঐ সকল কথা পূর্বে হবে, যা আদি হতে সকল নবী বলে আসছেন। এই কুধারণা যে, শেষ যুগে ঐ মরিয়ম পুত্র মসীহই পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এটি তো কুরআন শরীফের মূল বিরোধী। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফকে তাকওয়া, ইমান, ইনসাফ ও বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখবে, তার কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, কাদের করীম খোদাওন্দ

এই উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে হুবহু মুসায়ী উম্মতের তুল্য করে সৃষ্টি করেছেন। তারা উত্তম বিষয়ের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে উত্তম বিষয় প্রদান করেছেন এবং তাদের মন্দ বিষয়ের তুলনায় মন্দ বিষয় প্রদান করেছেন। এই উম্মতের মধ্যে কেউ-কেউ এরূপ রয়েছেন, যারা বনী ইসরাঈলের নবীগণের সাথে সাদৃশ্য রাখেন এবং কেউ কেউ এরূপ রয়েছে, যারা 'মাগযুবি আলায়হিম' ইহুদীর সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটার দৃষ্টান্তএরূপ, যেরূপে একটি গৃহে উত্তম, মনোরম ও সুসজ্জিত কক্ষ থাকে, যা ক্ষমতাবান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকগণের বসার স্থান এবং যার কোন কোন অংশে শৌচাগারও থাকে এবং নর্দমাও থাকে এবং গৃহের মালিক চাইলেন যে, এই প্রাসাদের মত আরেকটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন, যেন পূর্বের প্রাসাদের যাবতীয় আসবাবপত্র এই প্রাসাদেও থাকে। সুতরাং এই দ্বিতীয় প্রাসাদটি হল ইসলামের প্রাসাদ। প্রথম প্রাসাদটি ছিল মুসায়ী সিলসিলার প্রাসাদ। এই দ্বিতীয় প্রাসাদটি কোন ব্যাপারে প্রথম প্রাসাদের মুখাপেক্ষী নয়। কুরআন শরীফ তওরাতের মুখাপেক্ষী নয় এবং এই উম্মত কোন ইস্রাইলী নবীর মুখাপেক্ষী নয়। প্রত্যেক কামেল পুরুষ, যিনি এই উম্মতের জন্য আগমন করেন তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশীষে লালিত পালিত এবং তাঁর ওহী মুহাম্মদী ওহীর প্রতিচ্ছায়া। এই বিষয়টিই অনুধাবনযোগ্য। পরিতাপ, আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ হযরত ইসা (আ.)-কে পুনরায় অবতরণ করাচ্ছে। তাঁরা অনুধাবন করেন না, এর অর্থ তো এই যে, ইসলাম যেন সাদৃশ্যের গৌরব লাভ না করে, না এই লাঞ্ছনা যে, কোন ইসরাইলী নবী আগমন করুন যাতে এই উম্মতের সংশোধন হয়।

এতদ্ব্যতীত খোদ কিতাবে যার কোন দৃষ্টান্তনাই, এরূপ অহেতুক বিশ্বাসের উপর জোর দেওয়া একান্তনিরর্থক কাজ। কুরআন শরিফে বর্ণিত হয়েছে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকাশে ওঠার জন্য আবেদন জানান হয়েছিল। কিন্তু তা একথা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে,

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

(সুরা বনী ইসরাইল: ৯৪)

(অর্থ : তুমি বল, আমার প্রভু পাক-পবিত্র, আমি একজন মানব রাসুল ছাড়া আর কিছুই নই- অনুবাদক)। তাহলে কি ইসা (আ.) মানুষ ছিল না যে, তাঁকে বিনা আবেদনে আকাশে উঠানো হয়েছে? তদুপরি কুরআন শরীফ হতে তো কেবলমাত্র রাফা ইলাল্লাহ্ (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দিকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত

অনুবাদক) প্রমাণিত হয়। এটি একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। (কুরআন শরীফ হতে) রাফা ইলাস্ সামায়ে (অর্থাৎ, আকাশের দিকে উন্নীত-অনুবাদক) প্রমাণিত হয় না। ইহুদীদের আপত্তি তো এই ছিল যে, যে ব্যক্তিকে ক্রুশে চড়ানো হয় সে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় খোদাতায়ালার দিকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হয় না। এই আপত্তিটিই খন্ডনযোগ্য ছিল। সুতরাং কুরআন শরীফ কোথায় এই আপত্তি খন্ডন করেছে? অর্থাৎ এই গোটা ঝগড়া-বিবাদের মূল এটিই ছিল যে, ইহুদীরা বলত ইসা (আ.) ক্রুশে নিহত হয়েছে এবং যে ব্যক্তি ক্রুশে নিহত হয় সে খোদাতায়ালার দিকে উন্নীত হয় না। এইজন্য ইসা (আ.) অন্যান্য নবীগণের ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে খোদাতায়ালার দিকে উন্নীত হননি। অতএব তিনি মুমিন নয় এবং নাজাতপ্রাপ্তও নয়। যেহেতু কুরআন পূর্ববর্তী ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, এজন্য এটি এই সিদ্ধান্তদান করেছে যে, ইসা (আ.) ও অন্যান্য নবীদের মত উন্নীত হয়েছেন। খোদার তো একটি বিরোধের মীমাংসা করে দেয়া উচিত ছিল। সুতরাং খোদাতায়ালা যদি এই সকল আয়াতে এই মীমাংসা না করে থাকেন, তাহলে বল, কোন্ জায়গায় তিনি এর মীমাংসা করেছেন? নাউযুবিল্লাহ, এই ধরনের ভুল ধারণা কি খোদাতায়ালার প্রতি আরোপ করা যেতে পারে যে, ঝগড়াটি ছিল তো ইহুদীদের পক্ষ হতে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হওয়ার, কিন্তু খোদা একথা বললেন যে, ইসা সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন। প্রকাশ থাকে যে, নাযাতের জন্য স্বশরীরে আকাশে যাওয়া শর্ত নয়। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হওয়াই শর্ত।

অতএব এস্থলে এই বিবাদের মীমাংসার জন্য একথা বলা উচিত ছিল যে, ইসা (আ.) অভিশপ্ত নয়; বরং নিশ্চয় তিনি আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এতদ্ব্যতীত, কুরআন শরিফে 'রাফা' (আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত) এর পূর্বে 'তাওয়াফ্ফা' (মৃত্যু) শব্দটি আনা হয়েছে, এটা সুস্পষ্টভাবে এই কথার দলিল যে, এটি ঐ 'রাফা' যা মৃত্যুর পর প্রত্যেক মুমিনের নসিব হয়। 'তাওয়াফ্ফা' এর এই অর্থ করা যে, হযরত ইসা (আ.)-কে জীবিত আকাশে উঠানো হয়েছে, এটিও ইহুদীদের ন্যায় কুরআন শরীফকে বিকৃত করার। কুরআন শরিফে ও সকল হাদিসে 'তাওয়াফ্ফা' শব্দটি দেহ হতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি কোন স্থানে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যে, কোন ব্যক্তিকে সশরীরে জীবিত আকাশে উঠানো হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, এই অর্থ গ্রহণ করলে এই বিতর্কে পড়তে হয় যে, কুরআন শরিফে ইসা (আ.)-এর মৃত্যুর সম্বন্ধে কোথাও উল্লেখ নাই এবং তিনি কখনো মৃত্যু বরণই করবেন না। কেননা যে জায়গায় ও যেস্থলে হযরত ইসা (আ.) সম্বন্ধে ‘তাওয়াফ্ফা’ শব্দটি থাকবে, সেখানে এই অর্থই করতে হবে যে, তিনি সশরীরে আকাশে চলে গেছেন বা যাবেন। তাহলে কিভাবে তাঁর মৃত্যু প্রমাণিত হবে?

অধিকন্তু মানুষ যদি পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে পারে, তাহলে খোদাতায়ালা হযরত ইসা (আ.)-কে ইহুদীদের সামনে কেন লজ্জিত করলেন ? কেননা যখন ইহুদীরা এই দলিল উপস্থাপন করেছিল যে, তোমাকে আমরা সত্য মসীহ বলে মানতে পারি না, কেননা মালাকী নবীর কিতাবে লিখিত আছে যে, ঐ সত্য মসীহ, যাঁর আগমনের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে, যখন তিনি আগমন করবেন তখন তাঁর পূর্বে নিশ্চয় ইলিয়াস নবী পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করেননি, এজন্য আমরা তোমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি না। তখন হযরত মসীহ তাদের এই উত্তর দেন যে, ঐ ইলিয়াস, যাঁর আগমনের কথা ছিল, তিনি হলেন ইউহান্না নবী। ইসলামের অনুসারীরা তাঁকে ইয়াহিয়া বলে সম্বোধন করে থাকে। এই উত্তরে ইহুদীরা ভয়ংকর অসন্তুষ্ট হল এবং হযরত ইসা (আ.)-কে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করল। বস্তুত যারা নিজেদের পুস্তকসমূহে–যার কিছু-কিছু আমার কাছে রয়েছে, হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের পুস্তকে লিখেন, যদি খোদাতায়ালা কিয়ামতের দিন আমাদের জিজ্ঞাসা করেন কেন তোমরা এই ব্যক্তিকে গ্রহণ করনি, তখন আমরা মালাকী নবীর কিতাব তাঁর সম্মুখে রেখে বলব, যতদিন পর্যন্ত ইলিয়াস নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন না করবেন ততদিন পর্যন্তবনী ইসরাইলদের সাথে ওয়াদাকৃত নবী দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করেননি। আমাদের একথা বলা হয়নি যতদিন পর্যন্ত ইলিয়াসের সাদৃশ্যপূর্ণ কেউ আগমন না করবেন ততদিন পর্যন্তসত্য মসীহ আগমন করবেন না। বরং আমাদের বলা হয়েছিল যে, সত্য মসীহের পূর্বে যথার্থভাবে ইলিয়াসের পুনরাগমন জরুরী। কিন্তু সেই কথা পূর্ণ হয়নি।

এরপর এই বিজ্ঞ ইহুদী যার পুস্তক আমার কাছে রয়েছে, নিজের এই যুক্তি নিয়ে বড়ই গর্বের সাথে  জনগণের কাছে আবেদন করেন, আল্লাহ্র প্রতি এরূপ

মিথ্যারোপকারীকে কেউ কি গ্রহণ করতে পারে, যে রূপকের মাধ্যমে কাজ করে এবং নিজ গুরু ইউহান্নাকে অযথা ইলিয়াস প্রতিপন্ন করে। অতঃপর উক্ত ইহুদী খুব উত্তেজনা প্রকাশ করেছে এবং এরূপ বিদ্রূপাত্মক ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষায় হযরত মসীহ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে যে, এখানে আমি তা উদ্ধৃত করতে অক্ষম। যদি কুরআন অবতীর্ণ না হত, তাহলে ইহুদীদের বাহ্যত সত্যাশ্রয়ী বলে মনে হত। কেননা মালাকী নবীর গ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে এই কথা নেই যে, সত্য সত্যই মসীহের পূর্বে ইলিয়াসের সাদৃশ্যপূর্ণ কেউ আগমন করবেন। বরং সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে মসীহের পূর্বে স্বয়ং ইলিয়াসের পুনরাগমন জরুরী। এমতাবস্থায় যদিও খৃস্টানরা হযরত মসীহের ঈশ্বরত্বের জন্য ক্রন্দন করে, তথাপি তাঁর নবুওয়তও প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয় বরং ইহুদীদের সঠিক বলে মনে হয়। সুতরাং খৃস্টানদের উপর কুরআন শরীফের এই অনুগ্রহ রয়েছে যে, এটা মসীহের সত্যতা প্রকাশ করেছে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন থেকে যায় আর তা এই যে, যে অবস্থায় মালাকী নবীর গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, যতদিন পর্যন্ত ইলিয়াস নবী পৃথিবীতে পুনরাগমন না করেন ততদিন পর্যন্ত ঐ সত্য মসীহ পৃথিবীতে আগমন করবেন না, যাঁর সম্বন্ধে বনী ইসরাইলের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। তাহলে এমতাবস্থায় হযরত মসীহকে গ্রহণ না করে এবং তাঁকে কাফির, ধর্মত্যাগী ও ধর্মহীন আখ্যায়িত করে ইহুদীরা কি অপরাধ করেছিল? তাদের সদুদ্দেশ্যের সমর্থনে এটি কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের সনদ অনুযায়ী তারা আমল করেছিল? হ্যাঁ, যদি মালাকী নবীর গ্রন্থে ইলিয়াসের সাদৃশ্যপূর্ণ কারো পুনরাগমনের কথা থাকত, তাহলে যে অবস্থায় ইহুদীরা অভিযুক্ত হতে পারত। কেননা এটি খুব বিতর্কযোগ্য বিষয় নয় যে, ইয়াহিয়া নবীকে ইলিয়াসের সদৃশ আখ্যায়িত করা হবে।

এই প্রশ্নের উত্তর এই, ইহুদীরা ভালভাবেই জানত যে, খোদাতায়ালার এ বিধান নেই, কোন ব্যক্তি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবে এবং এর দৃষ্টান্তপূর্ব হতে বিদ্যমান ছিল না। অতএব এটি কেবলমাত্র রূপক ছিল, যেরূপে আরও শত-শত রূপক খোদাতায়ালার কিতাবসমূহে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এরূপ রূপক সম্বন্ধে ইহুদীরা অনবহিত ছিল না। তদুপরি হযরত ইসা আলাইহিস সালামের সাথে স্বর্গীয় সমর্থনও যুক্ত হয়েছিল এবং তাঁর সঠিক অন্তর্দৃষ্টির জন্য প্রচুর ধন

ভান্ডার ছিল। ইহুদীরা ঐগুলি সনাক্ত করতে পারত এবং ঐগুলির উপর ইমান আনতে পারত। কিন্তু তারা দিনের পর দিন তাদের দুষ্টামী ও দুষ্কৃতিতে বেড়ে চলল। যে জ্যোতি সত্যবাদীগণের মধ্যে থাকে তা নিশ্চয়ই তারা হযরত ইসা (আ.)-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু বিদ্বেষ ও কার্পণ্য এবং দুষ্টামী হতে তারা মুক্ত হল না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এই প্রশ্ন তো কেবলমাত্র ইহুদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা প্রথমবারের মত এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা যদি তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তাহলে কুরআন শরীফ এই পরীক্ষা হতে তাদের রক্ষা করতে পারত। কেননা কুরআন শরীফ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল যে, ইসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। কেবলমাত্র এটিই নয়। বরং সুরা মায়েদায় দ্ব্যর্থহীন ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তিনি পুনরায় আগমন করবেন না। কেননা 'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী' আয়াতে এটি বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমিই কি বলেছিলে যে, আমাকে ও আমার মাতাকে খোদা রূপে মান্য কর? তখন হযরত ইসা (আ.) উত্তর দিবেন হে প্রভু! যদি আমি এরূপ বলে থাকতাম তাহলে তুমি জানতে। কেননা তোমার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই নেই। আমি তো কেবলমাত্র ঐ কথাই বলেছিলাম, যার তুমি আদেশ দান করেছিলে। অতঃপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন হতে তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। আমি তাদের অবস্থার কি জানতাম?

এখন এটি সুস্পষ্ট যে, যদি একথা সত্য হয়, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন, চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং খৃস্টানদের সাথে যুদ্ধ করবেন, তাহলে কিয়ামতের দিন তিনি খোদাতায়ালার দরবারে কিভাবে বলবেন যে, যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে এরপর আমি কি জানি খৃস্টানরা কোন পথ অবলম্বন করেছিল? যদি তিনি এই উত্তরই প্রদান করেন যে, আমি জানিনা, তাহলে তাঁর চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কেননা যে ব্যক্তি একথা জানে যে, সে পৃথিবীতে পুনরাগমন করেছিল এবং দেখেছিল খৃস্টানরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে, এতদসত্ত্বেও খোদাতায়ালার কাছে অস্বীকার করছে যে, আমি কিছুই জানিনা আমার পরে তারা কি করেছিল, তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী কে হতে পারে? সঠিক উত্তর তো এই ছিল যে, হাঁ আমার খোদাওন্দ, খৃস্টানদের গোমরাহী সম্বন্ধে আমি সম্যক জ্ঞাত আছি; কেননা আমি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে গমন করে

সেখানে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করেছিলাম এবং ক্রুশ ভেঙেছিলাম। সুতরাং আমার কোন অপরাধ নেই। যখন আমি জ্ঞাত হলাম যে, তারা মুশরিক, তখন আমি তাদের শত্রু হয়ে গেলাম। বরং এমতাবস্থায় যখন কিয়ামতের পূর্বে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করে থাকবেন এবং ঐ সকল লোককে শাস্তি প্রদান করে থাকবেন, যারা তাঁকে খোদা মনে করছিল, তখন তাঁর কাছে খোদাতায়ালার এরূপ প্রশ্ন একটি অযথা প্রশ্ন হবে। কেননা যখন খোদাতায়ালার জ্ঞানে আছে যে, এই ব্যক্তি নিজেই উপাস্য আখ্যায়িত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে লোকদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিল, তখন তাকে এরূপ প্রশ্ন করা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থি। মোট কথা, খোদাতায়ালা মুসলমানদের এটি যতখানি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তিনি পৃথিবীতে পুনরাগমন করবেন না, অবশ্য তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ কারো আগমন জরুরী হবে, যদি এই ধরনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মালাকী নবীর গ্রন্থে থাকত, তাহলে  ইহুদীরা বিনাশ হত না। সুতরাং নিঃসন্দেহে ঐ সকল লোক ইহুদীর চেয়ে নিকৃষ্ট, যারা খোদাতায়ালার পবিত্র কালামে এতখানি ব্যাখ্য পেয়েও হযরত ইসা (আ.)-এর পুনরাগমনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়াও আমাদের বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা লোকদের ধোঁকা দিয়ে একথা বলে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কিন্তু তারা জানে না, হাদিসে কোথায় এবং কোন জায়গায় লেখা আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খাতামুল আম্বিয়া' হওয়া সত্ত্বেও ঐ বনী ইসরাইলী নবীই পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন, যাঁর নাম ছিল ইসা এবং যাঁর উপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল? যদি কেবলমাত্র ইসা অথবা ইবনে মরিয়ম এর নামে ধোঁকায় পড়তে হয়, তাহলে কুরআন করীমের সুরা তাহরিমে এই উম্মতের কোন-কোন ব্যক্তির নামও ইসা অথবা ইবনে মরিয়ম রাখা হয়েছে। কেননা, যখন খোদাতায়ালা উল্লেখিত সুরায় এই উম্মতের কোন ব্যক্তিকে মরিয়মের সাথে  সাদৃশ্যযুক্ত করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে রুহ্ ফুৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন এটা সুস্পষ্ট যে, ঐ রুহ্, যা মরিয়মের মধ্যে ফুঁকে দেয়া হয়েছিল, তা ছিল ইসা। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে এই উম্মতের কোন ব্যক্তি প্রথমে নিজের খোদা প্রদত্ত তাকওয়ার দরুণ মরিয়ম হবে অতঃপর ইসা হবে, যেমন কিনা বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদাতায়ালা প্রথমে আমার নাম মরিয়ম রেখেছেন অতঃপর রুহ্ ফুৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন

এবং সবশেষে আমার নাম রেখেছেন ইসা।

হাদিসে তো সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাত্রিতে হযরত ইসাকে মৃতগণের রুহের মধ্যেই দেখেছেন। তিনি (সা.) আরশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, কিন্তু ইসা নামের এরূপ কাউকেও দেখলেন না, যিনি সশরীরে পৃথকভাবে সেখানে অবস্থিত ছিলেন। তিনি দেখলেন তো ঐ রুহ্‌কেই দেখলেন, যা মৃত ইয়াহিয়ার পার্শ্বে ছিল। বলাবাহুল্য, জীবিতরা মৃতদের আবাসস্থলে অবস্থান করতে পারে না। মোট কথা, খোদা নিজের বাক্য দ্বারা হযরত ইসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাজ দ্বারা অর্থাৎ, দর্শন দ্বারা ঐ একই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। যদি এখনো কেউ না বুঝে, তবে তার সাথে  খোদা বুঝা-পড়া করবেন।

এছাড়া, ইহুদীদের চেয়ে এদের অধিক অভিজ্ঞতা হয়েছে, মানুষকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রেরণ করা খোদাতায়ালার বিধান নয়। নতুবা আমাদের তো ইসার তুলনায় হযরত সৈয়্যদনা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আগমনের অধিক প্রয়োজন ছিল এবং এতেই আমাদের আনন্দ নিহিত ছিল। কিন্তু ইন্নাকা মাইয়্যিতুন (নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল-অনুবাদক) বলে খোদাতায়ালা এই আশা হতে আমাদের বঞ্চিত করে দিয়েছেন। একথাটি ভেবে দেখার যোগ্য, যদি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমনের পথ খোলা থাকত, তাহলে খোদাতায়ালা কিছুদিনের জন্য ইলিয়াস নবীকে কেন পৃথিবীতে দ্বিতীয় বার প্রেরণ করেননি এবং এভাবে লক্ষ-লক্ষ ইহুদীকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করালেন? অবশেষে হযরত মসীহ নিজেই এই সিদ্ধান্তদিলেন, দ্বিতীয়বার আগমনের দ্বারা কোন সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির আগমনকে বুঝায়। এই ফয়সালা এখন পর্যন্ত ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান আছে। অতঃপর একবার যে প্রশ্নটির সমাধান হয়েছে এবং যে পথটি বিপজ্জনক প্রতীয়মান হয়েছে, ঐ পথে পা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন– এর উপর জিদ করে ইহুদীরা কুফরী ও লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি কল্যাণ লাভ করেছে এই যুগের মুসলমানরা ঐ কল্যাণ লাভের আশা রাখে? যেই গর্তে একটি বড় দল নিহত হয়েছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এই লোকেরা ঐ গর্তেই কেন হাত দিচ্ছে ?

لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين

(অর্থাৎ, মুমিন একই গর্তে দুবার দংশিত হয় না –অনুবাদক)
হাদিসটি কি মনে নেই? এখেকে প্রতীয়মান হয়, এরা মৃত্যুর কথা ভুলে গেছে। ঐ সকল লোক যে সুরা পাঁচবার নিজেদের নামাযে পাঠ করে, অর্থাৎ, 'গায়রিল মাগযুবি আলায়হিম ওয়ালায্যাল্লীন,' কেন তারা এটার তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করে না এবং কেন এই কথা ভাবে না যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতেও কোন-কোন সাহাবার এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আঁ-জনাব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(অর্থাৎ, মুহাম্মদ রাসুল ছাড়া কিছু নন। তাঁর পূর্বের সকল রাসুল গত হয়েছেন। সুরা আলে ইমরানঃ ১৪৫- অনুবাদক)–এই আয়াতটি পাঠ করে এই ধারণা নস্যাৎ করে দিলেন এবং আয়াতের অর্থে বুঝিয়ে দিলেন, এমন কোন নবী নেই যিনি মৃত্যু বরণ করেননি। সুতরাং যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এতে আক্ষেপের কোন অবকাশ নেই। এই বিষয়টি সকলের জন্য অভিন্ন। এটি সুস্পষ্ট যে, যদি সাহাবা (রা.) -গণের এই ধারণা থাকত ইসা (আ.) ছয়শত বৎসর যাবত আকাশে জীবিত বসে রয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা হযরত আবু বকর (রা.) এর কাছে উক্ত ধারণা উপস্থাপন করতেন। কিন্তু সে দিন থেকে সবাই স্বীকার করলেন, সকল নবী মৃত্যু বরণ করেছেন। যদি কারো মনে এই ধারণা থাকত, ইসা জীবিত আছেন তাহলে বস্তুর ন্যায় নিজের হৃদয় হতে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এটি আমি এজন্য বলেছিলাম, কেননা এটি সম্ভব যে, খৃষ্ট ধর্মের সংশ্রব ও সাহচর্যের প্রভাবে এরূপ কোন ব্যক্তি–যে নির্বোধ ও যার বুদ্ধি জ্ঞান সঠিক নয়, ধারণা করতে পারে যে, সম্ভবত ইসা এখনও জীবিতই আছেন। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, হযরত আবুবকর (রা.)-এর উপদেশের পর সাহাবাগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত নবী ছিলেন সকলেই মৃত্যু বরণ করেছেন এবং এটি সর্ব প্রথম 'ইজমা' (ঐক্যমত) ছিল, যা সাহাবা (রা.)- গণের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। সাহাবা (রা.)-গণ, যাঁরা আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমে বিভোর ছিলেন, তাঁরা কিভাবে একথা গ্রহণ করতে পারতেন যে, তাঁদের সম্মানিত নবী, যিনি নবীকূলের সর্দার ছিলেন, তিনি চৌষট্টি

বৎসরের আয়ুও লাভ করলেন না, কিন্তু ইসা ছয়শত বৎসর যাবত আকাশে জীবিত বসে রয়েছেন? নবী-প্রেম কস্মিনকালেও এই রায় অনুমতি দেয় না যে, তাঁরা ইসা আলাইহিস সালামের প্রতি বিশেষভাবে এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে থাকবেন। **অভিসম্পাত এরূপ বিশ্বাসের উপর, যদ্দরুণ আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা অনিবার্য হয়ে পড়ে!** এ সকল লোক তো রসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমিক ছিলেন। তাঁরা তো একথা শুনলে জীবিতই মরে যেতেন যে, তাঁদের প্রিয় রাসুল মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু ইসা আকাশে জীবিত বসে রয়েছেন। ঐ রাসুল না তাদের কাছে বরং খোদাতায়ালার কাছেও, সকল নবীর চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। এজন্য যখন খৃস্টানরা নিজেদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই মকবুল রাসুলকে গ্রহণ করল না এবং তাঁকে (অর্থাৎ, হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে-অনুবাদক) এতখানি উপরে তুলল যে, খোদায় পরিণত করল, তখন খোদাতায়ালার আত্মাভিমানের প্রেরণা মুহাম্মদী দাসদের মধ্য হতে এক দাসকে অর্থাৎ এই বিনীত দাসকে তাঁর [অর্থাৎ হযরত ইসা (আ.) এর-অনুবাদক] সদৃশ করে এই উম্মতে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর তুলনায় স্বীয় আশিস ও পুরস্কারের বহুলাংশ তাঁকে দান করলেন, যাতে খৃস্টানরা বুঝতে পারে যে, সকল আশিস খোদাতায়ালার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

মোটকথা, ইসা ইবনে মরিয়মের সদৃশ এর আগমনের এ-ও একটি উদ্দেশ্য ছিল, যেন তাঁর ঈশ্বরত্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়। মানুষের পক্ষে আকাশে গিয়ে স্বশরীরে বসবাস করা এভাবেই আল্লাহর বিধানের পরিপন্থি, যেভাবে ফিরিশ্তার পক্ষে শরীর ধারণ করে বসবাস করা তাঁর বিধানের পরিপন্থি।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

অর্থাৎ- তুমি আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না,

(সুরা ফাতাহ্: ২৪- অনুবাদক)।

উপরন্তু এই নির্বোধ জাতি চিন্তা করে দেখে না, ক্রুশে দেয়ার সময় যখন হযরত ইসা আলাইহিস সালামের প্রচার কার্য অসমাপ্ত ছিল এবং এখনও ইহুদীদের যে দশটা গোত্র অন্যান্য দেশে ছিল তারা তাঁর নাম সম্বন্ধেও অবহিত ছিল না, এমতাবস্থায় হযরত ইসা কিভাবে ভাবলেন যে, স্বীয় আরাধ্য কাজ অসমাপ্ত রেখে তিনি আকাশে গিয়ে বসে থাকবেন? তদুপরি এ-ও আশ্চর্যের ব্যাপার, ইসলামী কিতাবসমূহে তো হযরত ইসাকে ভ্রমণকারী নবী হিসাবে লেখা হয়েছে;

কিন্তু তিনি তো মাত্র সাড়ে তিন বৎসর স্ব-গ্রামেই থেকে আকাশে পথের পথিক হলেন।

বলাবাহুল্য যে, যখন কেবলমাত্র অনর্থক কল্প-কাহিনীর উপর নির্ভর করে হযরত ইসাকে খোদারূপে মান্য করা হচ্ছে, অতঃপর যদি তিনি আকাশ থেকে ফিরিশ্তাসহ অবতীর্ণ হওয়ার অলৌকিক ক্রিয়াও প্রদর্শন করেন, তাহলে ঐ সময় কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? স্মরণ রাখ, যার অবতীর্ণ হওয়া নির্ধারিত ছিল, তিনি যথাসময়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। আজ সকল লিখন পূর্ণ হয়েছে। সকল নবীর কিতাব এই যুগেই উদ্ধৃতি দিয়েছে। খৃস্টানদেরও এই বিশ্বাসই রয়েছে যে, এই যুগেই প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন জরুরী ছিল। এসকল কিতাব সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল, আদম হতে ছয় হাজার বৎসরের শেষে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন জরুরী ছিল। এই সকল কিতাবে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল, আদম হতে ছয় হাজার বৎসর শেষও হয়েছে। আরও লেখা ছিল, এর পূর্বে পুচ্ছবিশিষ্ট তারকা উদিত হবে এবং বহুদিন পূর্বে উক্ত তারকা উদিত হয়েছে। আরও লিখিত ছিল, তাঁর যুগে একই মাসে যা রমযান মাসে হবে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং বহুদিন পূর্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আরও লিখিত ছিল তাঁর যুগে প্রচন্ডভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে। এই সংবাদ ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি দেখছি প্লেগ এখনও পিছু ছাড়েনি। এছাড়া কুরআন শরীফ ও হাদিস এবং পূর্বের কিতাবসমূহে লিখিত ছিল তাঁর যুগে একটি নতুন বাহন সৃষ্টি হবে–যা আগুনের দ্বারা চলবে এবং ঐ দিনগুলিতে উষ্ট্র বেকার হয়ে যাবে। এই শেষাংশের হাদিস সহী মুসলিমেও উল্লেখ রয়েছে এবং উক্ত বাহন রেলগাড়িও আবিষ্কার হয়েছে। আরও লিখা ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হবেন এবং শতাব্দীরও একুশ বৎসর অতিক্রান্তহয়েছে। (এখন শতাব্দী শেষ হয়ে পরবর্তী শতাব্দীরও ২৮ বৎসর চলছে-প্রকাশক) আল্লাহ্‌র এই সকল নিদর্শনের পর এখন যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে আমাকে নয় বরং সকল নবীকে অস্বীকার করছে এবং খোদাতায়ালার সাথে যুদ্ধ করছে। যদি তার জন্ম না হত তবে তা তার জন্য উত্তম ছিল।

ভালভাবে স্মরণ রাখ সকল মন্দ ও পতন–যা ইসলামে দেখা দিয়েছে, এমনকি এই ভারতবর্ষেই ২৯ লক্ষ মানুষ ধর্মত্যাগী হয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছে, এর কারণ এটিই ছিল, মুসলমানরা হযরত ইসা (আ.) সম্বন্ধে অযথা ও মাত্রাতিরিক্ত আশা

পোষণ করে এবং তাঁকে প্রত্যেক গুণে বৈশিষ্ট্য দান করে খৃস্টানদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এমনকি, যেসব মানবীয় বৈশিষ্ট্য তারা হযরত সৈয়্যদনা পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করে, যদি কোন ঐতিহাসিক পুস্তকে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সৈয়্যদনা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে লেখা থাকে, তাহলে তারা 'তওবা' 'তওবা' বলে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলাবাহুল্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন-কোন সময় অসুস্থ হতেন এবং তাঁর জ্বরও দেখা দিত এবং তিনি ঔষধও সেবন করতেন এবং কোন-কোন সময় সিঙ্গাও লাগাতেন। কিন্তু যদি এরই সাদৃশ্য হযরত মসীহ সম্বন্ধে লেখা হয়, তিনি জ্বর বা অন্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্তহয়েছিল, তাহলে তারা শিউরে উঠবে যে, এটি মসীহের মর্যাদার পরিপন্থি, যদিও তিনি মাত্র একজন অক্ষম মানুষ ছিলেন এবং সকল মানবীয় দুর্বলতার অংশীদার ছিলেন। তাঁর আরও চারজন সহোদর ভ্রাতা ছিল। কেউ-কেউ তাঁর বিরুদ্ধবাদীও ছিল। তাঁর দু'জন সহোদর বোন ছিল। তিনি একজন দুর্বল গড়নের মানুষ ছিলেন। তাঁকে ক্রুশে কেবল দু'টি পেরেক ঠোঁকা মাত্রই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। হায় আক্ষেপ! যদি মুসলমানরা হযরত ইসা (আ.)-এর ব্যাপারে কুরআন শরীফের কথা অনুযায়ী চলত এবং তাঁকে মৃত বলে বিশ্বাস করত এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী তাঁর পুনরাগমন নিষিদ্ধ মনে করত, তাহলে ইসলামে যে পতন এসেছে তা আসত না এবং খৃস্টধর্ম অচিরেই শেষ হয়ে যেত। আল্লাহ্‌র শোকর বর্তমানে আকাশ হতে খোদা ইসলামের হাত ধরেছেন।

**এসব কথা আমি সাহেবযাদা মৌলভী আবদুল লতিফ সাহেবকে বলেছিলাম এবং পরিশেষে যে বিষয়টি আমি তাঁকে বুঝিয়েছিলাম তা ছিল এই: ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে হযরত ইসা আলাইহিস সালামের মধ্যে ১৬টি বিশেষত্ব ছিল।**

১। তিনি বনী ইসরাইলের জন্য একজন প্রতিশ্রুত নবী ছিলেন, যেভাবে এ ব্যাপারে ইসরাইলী নবীদের গ্রন্থসমূহ সাক্ষী রয়েছে।

২। মসীহ এরূপ সময় আগমন করেছিলেন যখন ইহুদীরা নিজেদের সাম্রাজ্য হারিয়েছিল, অর্থাৎ, এই দেশে (প্যালেস্টাইনে-অনুবাদক) ইহুদীদের কোন সাম্রাজ্য রইল না; তদ্রূপই কাশ্মীরীরাও ইহুদীদের অন্তর্ভূক্ত। তাদের ইসলাম

গ্রহণের পর সম্রাটদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া এরূপ একটি ঘটনা, যা অস্বীকার করা যায় না। যা হোক, হযরত মসীহের আবির্ভাবের সময় দেশের এই অংশ (প্যালেস্টাইন-অনুবাদক) হতে ইহুদীদের সাম্রাজ্য লোপ পেয়েছিল এবং তারা রোমান শাসনের অধীনে জীবন অতিবাহিত করছিল এবং রোমান শাসনের সাথে ইংরেজ শাসনের খুব সাদৃশ্য ছিল।

৩। তিনি এরূপ সময়ে আগমন করেছিলেন যখন ইহুদীরা অনেক ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক ফিরকা অন্য ফিরকার বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাদের মধ্যে কঠোর পারস্পরিক শত্রুতা এবং কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের মতভেদের আধিক্যের দরুণ তওরাতের অধিকাংশ বিধি-নিষেধ সন্দেহজনক হয়ে পড়ছিল। কেবলমাত্র খোদার একত্ব সম্বন্ধে তারা পারস্পরিক ঐক্যমত পোষণ করত। অবশিষ্ট অধিকাংশ ছোট-ছোট মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের শত্রু ছিল। কোন উপদেষ্টা তাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করতে পারত না। এমতাবস্থায় তারা একজন স্বর্গীয় হাকিম অর্থাৎ, মীমাংসাকারীর মুখাপেক্ষী ছিল, যিনি খোদার কাছ থেকে তাজা ওহী প্রাপ্ত হয়ে সত্যবাদীদের সমর্থন করবেন। কিন্তু আল্লাহর অমোঘ বিধানে তাদের সকল ফিরকার মধ্যে এরূপ গোমরাহীর মিশ্রণ ঘটেছিল তাদের মধ্যে একজনকেও সত্যাশ্রয়ী বলা যেত না। প্রত্যেক ফিরকার মধ্যে কিছু না কিছু মিথ্যা এবং ধর্ম সম্বন্ধে অতি হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই কারণটিই সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইহুদীদের সকল ফিরকা হযরত মসীহকে দুশমন প্রমাণ করেছিল এবং তাঁর প্রাণ হরণ করার চেষ্টায় তারা লিপ্ত ছিল। কেননা, প্রত্যেক ফিরকা চাইত, হযরত মসীহ সম্পূর্ণরূপে তাদের সত্যায়নকারী হোক এবং তাদের ন্যায়নিষ্ঠ ও পুণ্যবান মনে করুক এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যাবাদী বলুক। কিন্তু এরূপ মনোরঞ্জন খোদাতায়ালার নবীর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

৪। মসীহ ইবনে মরিয়মের জন্য জিহাদের আদেশ ছিল না। হযরত মুসার ধর্ম এই কারণে ইউনানী (গ্রীক) ও রোমানদের দৃষ্টিতে খুবই নিন্দনীয় হয়েছিল যে, তারা ধর্মের উন্নতির জন্য যেকোন অজুহাতে তলোয়ার ধারণ করত। বস্তুত আজও তাদের পুস্তকসমূহে হযরত মুসার ধর্ম সম্বন্ধে সবসময় এই আপত্তি রয়েছে যে, তাঁর আদেশ ও এরপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা যিহসুয়ের আদেশে

কয়েক লক্ষ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া দাউদ ও অন্যান্য নবীগণের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলিও এই আপত্তিকে জোরদার করছিল। সুতরাং মানব প্রকৃতি এই কঠোর আদেশকে সহ্য করতে পারল না। যখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপরোক্ত ধারণা চরম সীমায় পৌঁছল তখন খোদাতায়ালা এরূপ একজন নবী প্রেরণ করতে চাইলেন, যিনি কেবলমাত্র সন্ধি ও শান্তির মাধ্যমে ধর্মকে বিস্তার দান করবেন এবং তওরাতের উপর হতে অন্যান্য জাতির সমালোচনা দূর করবেন। অতএব উক্ত সন্ধি ও শান্তির নবী ছিলেন ইবনে মরিয়ম।

৫। হযরত ইসার সময়ে সাধারণভাবে ইহুদী আলেমদের চাল-চলন অত্যন্তবিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের কথা ও কাজে সঙ্গতি ছিল না। তাদের নামায, তাদের কথা ও কাজে সঙ্গতি ছিল না। তাদের নামায ও রোযা কেবলমাত্র রিয়াকারীতে (লোক দেখানো) পূর্ণ ছিল। এই সকল মর্যাদা-লোভী আলেম সম্প্রদায় রোমান শাসনের অধীনে এরূপ দুনিয়ার কীট হয়ে গিয়েছিল যে,  প্রতারণা, আত্মসাৎ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা-সাক্ষ্য, মিথ্যা ফতওয়া ইত্যাদি দ্বারা জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির মধ্যেই তাদের সকল শক্তি নিয়োজিত ছিল। কেবলমাত্র সাধুবেশ ধারণ, বড়-বড় জুব্বা ছাড়া তাদের মধ্যে এক বিন্দু পরিমাণ আধ্যাত্মিকতাও অবশিষ্ট ছিল না। তারা রোমান সরকারের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মর্যাদা লাভের খুব অভিলাসী ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের জোড়াতালি এবং মিথ্যা খোশামোদের দ্বারা তারা সরকারের কাছ থেকে সম্মান ও কিছু পরিমাণে শাসন-ক্ষমতা পেয়েছিল। যেহেতু পার্থিব স্বার্থ ছাড়া তাদের মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, সেহেতু তওরাতের উপর আমল করলে আকাশে যে মর্যাদা লাভ করা যেত সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণরূপে অমনযোগী হয়ে পার্থিবতার কীটে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সকল গৌরব জাগতিক মান-মর্যাদার মধ্যেই নিহিত বলে মনে করত। এই কারণেই মনে হয় রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে নিয়োজিত ঐ দেশের গভর্ণরের উপর তাদের কিছুটা প্রভাবও ছিল। কেননা তাদের বড়-বড় দুনিয়াসক্ত মৌলভী দূর-দূরান্তসফর করে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতও করত এবং সরকারের সাথে  তারা সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তাদের অনেক ব্যক্তি সরকারের বৃত্তিভোগীও ছিল। এই সুবাদে তারা নিজদের সরকারের বড় খয়ের-খাঁ বলে বেড়াত। এই জন্য যদিও তারা এক দিক হতে সরকারের ছা-পোষা ছিল, কিন্তু খোশামোদের মাধ্যমে তারা সম্রাট ও তার বড়-

বড় কর্মকর্তাদের কাছে নিজেদের সম্বন্ধে অত্যন্তসুধারণা সৃষ্টি করেছিল। এই চালবাজির দরুনই তাদের আলেমরা সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে সম্মানিত বলে বিবেচিত হতো এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। যাহোক, গালিলের অধিবাসী ঐ বেচারা, যাঁর নাম ইসা ইবনে মরিয়ম, তাঁকে এই সকল দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকের দরুণ খুবই নাজেহাল করা হয়েছিল। তাঁর মুখে কেবলমাত্র থু-থু-ই দেয়া হয়নি, বরং গভর্ণরের নির্দেশে তাঁকে জেলে দেয়া হয়েছিল, যদিও তাঁর এক বিন্দু পরিমাণ অপরাধও ছিল না। এটি সরকারের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র ইহুদীদের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছিল। কেননা সরকারের কর্ম পদ্ধতির নীতি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে খুশি করতে হবে। সুতরাং ঐ গরীব বেচারার কে ধার ধারত? এটাই ছিল আদালত–যার ফল এই হল, পরিশেষে তাঁকে ইহুদী মৌলভীদের কাছে হস্তান্তর করা হল এবং তারা তাঁকে ক্রুশে চড়িয়ে দিল। খোদা, যিনি আসমান ও যমীনের প্রভু, তিনি এমন আদালতের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন! কিন্তু আক্ষেপ এই সকল সরকারের প্রতি, যারা আকাশের খোদার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। এরূপ কথিত আছে, এই দেশের গভর্ণর পিলাত সস্ত্রীক হযরত ইসার শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিতে চাচ্ছিলেন! কিন্তু দুর্দান্তইহুদী আলেমরা পার্থিব কারণে সম্রাটের কাছে কিছুটা সম্মানিত ছিল। তারা পিলাতকে এই বলে ধমক দিল, যদি তুমি এই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান না কর, তাহলে আমরা সম্রাটের কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করব। তখন সে ভীত হয়ে পড়ল। কেননা, সে কাপুরুষ ছিল এবং স্বীয় উদ্দেশ্যে দৃঢ় থাকতে পারেনি। এই ভীতি এজন্যই তাকে পেয়ে বসেছিল, কেননা কোন-কোন সম্মানিত ইহুদী আলেম সম্রাটের সাথে পর্যন্ত নিজেদের যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছিল। তারা গোপনে সম্রাটকে এই সংবাদ দিত যে, এই ব্যক্তি একজন ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং সরকারের নেপথ্য দুশমন এবং সে একটি দল গঠন করে সম্রাটের উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছে। বাহ্যিকভাবে এই অসুবিধাও ছিল, এই সাদাসিধা গরীব মানুষটির সাথে সম্রাট ও তাঁর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং রিয়াকার (যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে) ও দুনিয়াদার লোকদের মত তাদের সাথে তাঁর কোন পরিচয়ও ছিল না। তিনি খোদার উপর ভরসা রাখতেন। কিন্তু অধিকাংশ ইহুদী আলেম নিজেদের দুনিয়াদারী, চালবাজি এবং খোশামোদের মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরে শিকড় গেঁড়ে ফেলেছিল। তারা সরকারের প্রকৃত বন্ধু ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছে, সরকার নিশ্চয় এই ধোকায় পড়ে গিয়েছিল তারা সরকারের বন্ধু!

এজন্য তাদের জন্য খোদার এক নিষ্পাপ নবীকে সর্ব প্রকারে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। কিন্তু যিনি আকাশ হতে অবলোকন করছেন এবং যিনি মানব হৃদয়ের মালিক, তাঁর দৃষ্টি হতে এই সকল দুষ্কৃতিপরায়ণরা গুপ্ত ছিলেন না। শেষ পরিণতি এই হল, হযরত ইসা (আ.)-কে ক্রুশে চড়িয়ে দেয়ার পর খোদা তাঁকে বাঁচালেন এবং তিনি করুণ চিত্তে রাত্রে বাগানে যে দোয়া করছিলেন খোদা তাঁর ঐ দোয়া মঞ্জুর করলেন, যেমন লিপিবদ্ধ আছে, মসীহ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করলেন যে, এই দুষ্ট ইহুদীরা তাঁর প্রাণের দুশমন এবং তাঁকে রেহাই দিবে না, তখন তিনি রাতের বেলা একটি বাগানে গিয়ে বিগলিতচিত্তে ক্রন্দন করেন এবং প্রার্থনা করেন, হে ইলাহী! যদি তুমি মৃত্যুর এই পেয়ালা আমার কাছে থেকে সরিয়ে নিতে চাও, তা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। তুমি যা চাও তাই কর। এই বিষয়ে আরবি ইঞ্জিলে এই লেখা আছে,

فبکی بدصوع جاریة وعبرات متحدرة فسمع لتقواه

অর্থাৎ- ইসা মসীহ এত ক্রন্দন করলেন যে, দোয়া করতে-করতে তাঁর মুখমন্ডল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং ঐ অশ্রু পানির মত তার কপালে বইতে লাগল।
তিনি ভীষণ কাঁদলেনএবং যরপরনাই ব্যাথাতুর হলেন। তখন তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁর দোয়া গৃহীত হল এবং খোদার ফযল কিছু উপকরণ সৃষ্টি করল, যাতে তাঁকে ক্রুশ হতে জীবিত নামানো হল। অতঃপর তিনি সঙ্গোপনে মালীর বেশে ঐ বাগান হতে, যেখানে তাঁকে কবরে রাখা হয়েছিল, বের হয়ে পড়েন এবং খোদার আদেশে অন্য দিকে প্রস্থান করেন। তাঁর সাথে তাঁর মাতাও গমন করেন, যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন,

اٰوَیۡنٰهُمَاۤ اِلٰی رَبۡوَۃٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّ مَعِیۡنٍ

অর্থাৎ- ক্রুশের এই বিপদের পর আমরা মসীহ ও তার মাতাকে এরূপ একটি দেশে পৌঁছে দিলাম, যার ভূমি ছিল অত্যন্তউচ্চ, পানি ছিল বিশুদ্ধ এবং যা ছিল বড় আরামপ্রদ স্থান। (সুরা মুমিনুন-৫১)

হাদিসে আছে, এই ঘটনার পর ইসা ইবনে মরিয়ম একশত বিশ বৎসর আয়ু লাভ করেন এবং এরপর মৃত্যুবরণ করে খোদার সাথে মিলিত হন এবং পরপারে পৌঁছে ইয়াহিয়া সমমর্যাদাভুক্ত হন। কেননা তাঁর ঘটনা এবং ইয়াহিয়া নবীর ঘটনা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। এতে কোন সন্দেহ নাই তিনি পুণ্যবান মানুষ ছিলেন এবং খোদার নবী ছিলেন। কিন্তু তাঁকে খোদা বলা কুফরী। তাঁর মত লক্ষ-লক্ষ

মানুষ পৃথিবী হতে অতিবাহিত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন। খোদা কাউকেও সম্মানিত করতে কখনো ক্লান্তহননি এবং ভবিষ্যতেও হবেন না।

৬। হযরত ইসা (আ.) রোমান সম্রাটের শাসনাধীনে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৭। রোমান সম্রাট খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পরিণাম এই হয়েছিল খ্রিস্টধর্ম সম্রাটের জাতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল। এমনকি কিছুকাল পরে রোমান সম্রাটও স্বয়ং খ্রিস্টান হয়ে গেলেন।

৮। যীশু মসীহ যাঁকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ ইসা (আ.) বলে থাকেন, তাঁর সময়ে একটি নতুন তারকা উদিত হয়েছিল।

৯। যখন তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল, তখন সূর্যে গ্রহণ লেগেছিল।

১০। তাঁকে কষ্ট দেয়ার পর ইহুদীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল।

১১। ধর্মীয় বিদ্বেষবশত তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছিল এবং এটিও প্রচার করা হয়েছিল, তিনি রোমান সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং বিদ্রোহী।

১২। যখন তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল, তখন তাঁর সাথে একজন চোরকেও ক্রুশে লটকানো হয়েছিল।

১৩। যখন তাঁকে পিলাতের সম্মুখে মৃত্যুদন্ডের জন্য পেশ করা হয়েছিল তখন পিলাত বলেছিল, আমি এই ব্যক্তির কোন অপরাধ দেখছি না।

১৪। তাঁর পিতা না থাকার কারণে যদিও তিনি বনী ইসরাইলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাদের সিলসিলার শেষ পয়গম্বর ছিলেন এবং তিনি হযরত মুসার পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৫। ইসা ইবনে মরিয়মের যুগে যিনি সম্রাট ছিলেন, তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের

আরাম, তাদের সফর ও অবস্থানের সুযোগ-সুবিধার জন্য অনেক নতুন-নতুন জিনিসের উদ্ভব হয়েছিল। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করা হয়েছিল এবং পান্থশালা তৈরী করা এবং আদালতের নতুন-নতুন পদ্ধতি উদ্ভব করা হয়েছিল। এটি ইংরেজ আদালতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল।

১৬। মসীহ (আ.) বিনা পিতায় জন্ম হওয়াতে আদমের (আ.) সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল।

মুসায়ী সিলসিলায় উপরোক্ত ষোলটি বিশেষত্ব হযরত ইসা (আ.)-এর মধ্যে রাখা হয়েছিল। অতঃপর যখন খোদাতায়ালা মুসায়ী সিলসিলাকে ধ্বংস করে মুহাম্মদীয়া সিলসিলা কায়েম করেন, যেমন নবীদের গ্রন্থসমূহে ওয়াদা করা হয়েছিল, তখন প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী খোদা চাইলেন, এই সিলসিলার প্রথম ও শেষ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেন। অতএব প্রথমে তিনি আঁ-হযরত (সা.)-কে মুসা (আ.)-র সাদৃশ্য আখ্যায়িত করেন, যেমন এই আয়াত হতে প্রতীয়মান হয়,

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে এই রাসুলকে সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছি, যেরূপে ফেরাউনের কাছে রাসুল প্রেরণ করেছিলাম। ( সুরা মুয্‌যাম্মিল-১৬)

হযরত মুসা (আ.) কাফেরদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করেছিলেন। আঁ-হযরত (সা.)-কেও যখন মক্কা হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং তাঁর পিছু নেয়া হয়েছিল, তখন মুসলমানদের হেফাযতের জন্য তিনি (সা.) তলোয়ার ধারণ করেছিলেন। অনুরূপভাবেই হযরত মুসার (আ.) কঠোর দুশমন ফেরাউনকে (জলে-চলতিকারক) নিমজ্জিত করা হয়েছিল। সেভাবেই আঁ-হযরত (সা.)-র কঠোর দুশমন আবু জাহলকে তাঁর সম্মুখে ধ্বংস করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আরও অনেক সাদৃশ্য রাখা হয়েছে, যেগুলো বর্ণনা করলে পুস্তকের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ তো হল সিলসিলার প্রথম দিককার সাদৃশ্যাবলী। কিন্তু মুহাম্মদী সিলসিলার শেষ খলিফার সাদৃশ্য থাকা জরুরী ছিল, যেন খোদাতায়ালার এই কথা বলা সঠিক হয় যে, ইমামের ধারা ও খলিফার ধারার দিক হতে মুহাম্মদী সিলসিলা মুসায়ী সিলসিলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সর্বদা প্রথম ও শেষের মধ্যে

সাদৃশ্য হতে এই ধারণা জন্মে যে, মধ্যবর্তীকালেও নিশ্চয় সাদৃশ্য থাকবে। যদিও জ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না।

**এইমাত্র আমি লিখেছি যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে হযরত ইসা (আ.)-র মধ্যে ষোলটি বিশেষত্ব ছিল, সেগুলি ইসলামের শেষ খলিফার মধ্যে থাকা আবশ্যক, যাতে তাঁর এবং হযরত ইসা মধ্যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। সুতরাং (বিশেষত্বগুলি নিম্নরূপ) :**

১। প্রতিশ্রুত হওয়ার বিশেষত্ব রয়েছে। যদিও ইসলামের হাজার-হাজার ওলী ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ প্রতিশ্রুত ছিল না। কিন্তু যাঁর মসীহ নামে আগমন করার কথা, তিনি হলেন প্রতিশ্রুত। সেভাবেই হযরত ইসা (আ.) এর পূর্বে কোন নবী প্রতিশ্রুত ছিলেন না। একমাত্র মসীহ (আ.) প্রতিশ্রুত ছিলেন।

২। সাম্রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার বিশেষত্ব রয়েছে। সুতরাং এতে কি কোন সন্দেহ আছে, যেভাবে হযরত ইসা ইবনে মরিয়মের কিছুকাল পূর্বে ঐ দেশ (প্যালেস্টাইন) হতে ইসরাইলী সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল সেভাবেই এই শেষ মসীহের জন্মের পূর্বে নানা ধরনের মন্দ আচরণের দরুণ ভারতবর্ষ হতে ইসলামী সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এর স্থলে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৩। তৃতীয় বিশেষত্ব যা প্রথম মসীহের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়েছিল তা এই-তাঁর সময় ইহুদীরা অনেক ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য স্বাভাবিকভাবে তাঁরা একজন বিচারকের মুখাপেক্ষী ছিল। সেভাবেই শেষ মসীহের সময়ে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ফিরকা (দল-উপদল-চলতিকারক) বিস্তার লাভ করেছিল।

৪। প্রথম মসীহের মধ্যে চতুর্থ বিশেষত্ব এই যে, তিনি জেহাদের জন্য প্রেরিত হননি। সেভাবেই শেষ মসীহও জেহাদের জন্য প্রেরিত নয় এবং কেনই বা প্রেরিত হবেন? যুগের গতি জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, তলোয়ার দ্বারা

কোন হৃদয় সান্তনা ও প্রবোধ লাভ করতে পারে না। বর্তমানে ধর্মের জন্য কোন সুসভ্য ব্যক্তি তলোয়ার ধারণ করেন না। এখন যুগের অবস্থা স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করছে মুসলমানদের ঐ সকল ফিরকা–যারা খুনী মাহদী ও খুনী মসীহের অপেক্ষারত, তারা সকলে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের ধারণাসমূহ খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যের পরিপন্থি এবং বুদ্ধি জ্ঞানও এই সাক্ষ্যই প্রদান করছে। কেননা, যদি খোদাতায়ালার এটাই উদ্দেশ্য হত মুসলমানরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করবে, তাহলে বর্তমান যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে মুসলমানরাই সর্বশ্রেষ্ঠ হত। তারাই কামান আবিষ্কার করত। তারাই নিত্য-নতুন বন্দুকের আবিষ্কারক হত। তাদের সব দিক হতে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা দান করা হত। একনকি ভাবিকালের যুদ্ধের জন্য তাদেরকেই বেলুন তৈরী করার জন্য মনোনীত করা হত। সমুদ্রের তলদেশে যে সমস্ত টর্পেডো আঘাত করে বেড়ায়, ঐগুলি তারাই নির্মাণ করত এবং জগদ্বাসীকে তাক লাগিয়ে দিত। কিন্তু এমনটি হয়নি। বরং উত্তরোত্তর খৃস্টানেরা এসব বিষয়ে উন্নতি সাধন করে চলছে। এতে প্রতীয়মান হয় যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা ইসলাম সম্প্রসারিত হোক, এটি খোদাতায়ালার অভিপ্রায় নয়। হ্যাঁ, খৃস্টধর্ম যুক্তি প্রমাণের দ্বারা দিন-দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং বড়-বড় পন্ডিত ও গবেষক ত্রিত্ত্ববাদের বিশ্বাস পরিহার করে চলেছে। এমনকি জার্মান সম্রাটও এই বিশ্বাস পরিহার করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, খোদাতায়ালা কেবল যুক্তি-প্রমাণের অস্ত্র দ্বারাই খৃস্টিয় ত্রিত্ত্ববাদের বিশ্বাসকে ভু-পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছে। এটাই নিয়ম যে দিকটা অধিক গুরুত্ববহ, পূর্ব থেকে তার লক্ষণাবলী প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য আকাশ হতে যুদ্ধ জয়ের কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ধর্মীয় যুক্তি-প্রমাণের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে এবং খৃস্টধর্ম আপনা-আপনি চুপসে যাচ্ছে এবং অচিরেই ধরাপৃষ্ঠ হতে দ্রুতবেগে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৫। প্রথম মসীহের মধ্যে পঞ্চম বিশেষত্ব এই ছিল, তাঁর যুগে ইহুদীদের চাল-চলন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষভাবে তাদের অধিকাংশ আলেম হিসাবে কথিত ব্যক্তিরা ভয়ানক প্রতারক ও দুনিয়াসক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা পার্থিব লোভ-লালসা ও পার্থিব সম্মানের কামনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। শেষ মসীহের যুগেও সাধারণ মানুষ এবং ইসলামের অধিকাংশ আলেমের অবস্থা তেমনি হচ্ছে। বিস্তারিত লেখার কোন প্রয়োজন নেই।

৬। হযরত মসীহ রোমান সম্রাটের অধীনে প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং এই বিশেষত্বের ক্ষেত্রে শেষ মসীহের অভিন্নতা রয়েছে। কেননা আমিও রোমান সম্রাটের রাজত্বের অধীনে প্রেরিত হয়েছি। এই রোমান সম্রাট হযরত মসীহের যুগের রোমান সম্রাটের চেয়ে উত্তম। কেননা ইতিহাসে লিখিত আছে, যখন রোমান সম্রাট অবগত হলেন, তার গভর্ণর পিলাত কৌশলে মসীহকে ক্রুশে নিহত করার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন এবং সংগোপনে তাঁকে কোন একদিকে ফেরারী করে দিয়েছেন, তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। এটি প্রমাণিত সত্য, ইহুদীদের ধর্মযাজকরাই (মাওলানারাই) এই গোপন সংবাদ দিয়েছিল যে, পিলাত সম্রাটের একজন বিদ্রোহীকে ফেরারী করে দিয়েছে। অতএব এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সম্রাটের আদেশে তৎক্ষণাৎ পিলাতকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং শেষ পরিণতি এই হল, কারাগারেই তার শিরোচ্ছেদ করা হয়। এভাবে পিলাত মসীহের প্রেমে শহীদ হল। এথেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ শাসক ও সম্রাট ধর্ম হতে বঞ্চিত থেকে যায়। *এই নির্বোধ সম্রাট ইহুদী আলেমদের অত্যন্তনির্ভরযোগ্য মনে করেছিল, তাদের সম্মান করেছিল,* তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করেছিল এবং হযরত মসীহকে হত্যা করার মধ্যে দেশের স্বার্থ নিহিত রয়েছে বলে প্রমাণ করেছিল। কিন্তু আমার ধারণা এই, এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য আমাদের সম্রাট (অর্থাৎ, ব্রিটিশ সম্রাট) মর্যাদায় এই অজ্ঞ ও যালেম রোমান সম্রাটের চাইতে শ্রেয়।

৭। অবশেষে খৃস্টধর্ম রোমান সম্রাটের জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। অতএব এই বৈশিষ্ট্যেও শেষ মসীহের অভিন্নতা রয়েছে। কেননা আমি দেখছি যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় আমার দাবি ও যুক্তি-প্রমাণসমূহ অত্যন্তআগ্রহের সাথে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শত-শত পত্র-পত্রিকায় সমর্থনসূচক দাবি ও যুক্তি প্রমাণাদি প্রকাশ করেছে। তারা আমার দাবির সত্যায়নে এরূপ কথা লিখেছে যে, একজন খৃস্টানের কলম হতে এরূপ কথা বের হওয়া মুশকিল। এমনকি কেউ-কেউ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছে, এই ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলে মনে হয়। কেউ-কেউ এও লিখেছে, প্রকৃতপক্ষে ইসা মসীহকে খোদা বানানো একটি ভয়ঙ্কর ভ্রম। কেউ-কেউ একথাও লিখেছে, এই সময়টি মসীহ মাওউদের দাবির সঠিক সময় এবং সময় নিজেই এর একটি দলিল। মোটকথা, তাদের এই সকল বর্ণনা হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তারা আমার দাবি কবুল করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং এই সকল হৃদয় হতে

দিনের পর দিন খৃস্টধর্ম নিজে-নিজেই বরফের ন্যায় গলে যাচ্ছে।

৮। মসীহের অষ্টম বিশেষত্ব ছিল, তাঁর সময় একটি নক্ষত্র উদিত হয়েছিল। এই বিশেষত্বেও শেষ মসীহরূপে আমাকে অংশীদার করা হয়েছিল। কেননা, মসীহের সময় যে নক্ষত্রটি উদিত হয়েছিল, সেটিই আমার সময় পুনরায় উদিত হয়েছে। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিও এই সময়টির সত্যায়ন করেছে এবং এথেকে এই সিদ্ধান্তেউপনীত হয়েছে, মসীহের আবির্ভাবের সময় সন্নিকট।

৯। ইসা মসীহের নবম বিশেষত্ব ছিল, যখন তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল তখন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। সুতরাং এই ঘটনায়ও খোদা আমাকে অংশীদার করেছেন। কেননা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা হল, এরপর কেবলমাত্র সূর্যেই নয় বরং একই রমযান মাসে চন্দ্রেও গ্রহণ লেগেছিল এবং এটি একবার ঘটেনি, বরং হাদীস অনুযায়ী দু'বার এই ঘটনা ঘটেছে। ঐ দুটি গ্রহণ সম্পর্কে ইঞ্জিলেও সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং কুরআন শরীফেও এই সংবাদ রয়েছে এবং হাদিসেও রয়েছে- যেমন দারকুতনীতে এই সংবাদ বিদ্যমান।

১০। ইসা মসীহকে কষ্ট দেয়ার পর ইহুদীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। সুতরাং আমার সময়েও ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে।

১১। ইসা মসীহের একাদশ বিশেষত্ব ছিল, ইহুদী আলেমরা তাঁকে বিদ্রোহী প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হয়েছিল এবং তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। সুতরাং এই ধরনের মোকদ্দমাতেও খোদার অমোঘ নিয়তি আমাকে অংশীদার করে দিয়েছে। আমার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা সাজানো হয়েছিল এবং অনুরূপভাবেই আমাকেও বিদ্রোহী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটি ঐ মামলা–যাতে দ্বিতীয় পক্ষের তরফ হতে মৌলভী আবু সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব সাক্ষীরূপে এসেছিল।

১২। ইসা মসীহের দ্বাদশ বিশেষত্ব ছিল, যখন তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল তখন তাঁর সাথে এক চোরকেও ক্রুশে লটকানো হয়েছিল। সুতরাং এই ঘটনাতেও আমাকে অংশীদার করা হয়েছিল। কেননা, যেদিন খোদাতায়ালা

আমাকে মামলা হতে রেহাই দিলেন এবং খোদা হতে নিশ্চিত ওহী লাভ করার ভিত্তিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী আমি শত-শত লোকের কাছে প্রকাশ করেছিলাম এবং তদনুযায়ী তিনি আমাকে নির্দোষরূপে খালাস করলেন, ঐ একই দিন আমার সাথে এক খ্রিস্টান চোরকেও আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এই চোর খৃস্টানদের পবিত্র জামা'ত মুক্তি ফৌজের লোক ছিল। সে কিছু টাকা চুরি করেছিল। এই চোরকে মাত্র তিন মাসের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। প্রথম মসীহের সঙ্গী চোরের ন্যায় তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়নি।

১৩। মসীহের ত্রয়োদশ বিশেষত্ব এই ছিল, যখন তাঁকে গভর্ণর পিলাতের সামনে পেশ করা হল এবং তাঁর মৃত্যুদন্ডের জন্য আবেদন করা হল, তখন পিলাত বললেন, আমি তাঁর কোন অপরাধ দেখছি না, যেজন্য তাঁকে এই শাস্তি প্রদান করব। ঠিক সেভাবেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেব আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বললেন, আমি আপনার উপর কোন অভিযোগ আনয়ন করছি না।

আমার ধারণা ক্যাপ্টেন ডগলাস স্বীয় দৃঢ়তা ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে পিলাতের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন। কেননা, পিলাত অবশেষে কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছিল এবং ইহুদীদের দুষ্কৃতিপরায়ণ মৌলভীদের ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ডগলাস কখনো ভীত হয়নি। তাঁর কাছে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী চেয়ার চেয়ে বলল, আমার কাছে লেফটেন্যান্ট সাহেবের চিঠি আছে। কিন্তু ক্যাপটেন ডগলাস এর কোন পরওয়া করেননি। কিন্তু আমি অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে চেয়ার দেয়া হয়েছিল এবং চেয়ারের জন্য আবেদন করায় তাকে ধমক দেয়া হয়েছিল। তাকে চেয়ার দেয়া হয়নি। যদিও আকাশে আসনপ্রাপ্ত ব্যক্তি পৃথিবীর আসনের মুখাপেক্ষী নয়, তবুও আমাদের যুগের এই পুণ্য-স্বভাববিশিষ্ট পিলাতকে আমি ও আমার জামাত চিরকাল স্মরণ রাখব এবং পৃথিবীর শেষাবধি তাঁর নাম সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে।

১৪। ইসা মসীহের চতুর্দশ বিশেষত্ব ছিল, তাঁর পিতা না থাকার কারণে তিনি ইসরাইল বংশোদ্ভুত ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি মুসায়ী সিলসিলার শেষ নবী ছিলেন এবং মুসার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেভাবে আমিও কুরায়শ বংশোদ্ভূত নই এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রেরিত

হয়েছি এবং সকলের শেষে প্রেরিত হয়েছি।

১৫। হযরত মসীহের পঞ্চদশ বিশেষত্ব ছিল, তাঁর যুগে পৃথিবীর পরিবেশ ও পরিমন্ডল এক নতুনত্ব লাভ করেছিল। রাস্তা-ঘাট নির্মিত হয়েছিল। ডাকের উত্তম ব্যবস্থা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। পথিকদের আরাম-আয়েশের জন্য অনেক কিছু উদ্ভাবন করা হয়েছিল এবং পূর্বের তুলনায় আইন-কানুন খুব পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেভাবে আমার সময় পৃথিবীর আরাম আয়েশের উপকরণের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এমনকি যাত্রীবাহী রেলগাড়ি আবিস্কৃত হয়েছে। এর সংবাদ কুরআন শরিফে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বস্তুগুলি পাঠক নিজেই বুঝে নিন।

১৬। হযরত মসীহের ষষ্ঠদশ বৈশিষ্ট্য ছিল, বিনা পিতায় জন্ম হওয়ার কারণে তিনি হযরত আদমের সদৃশ ছিলেন। সেভাবেই আমিও যমজ জন্মগ্রহণ করার দরুণ হযরত আদমের সদৃশ। এটা হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবির উক্তি অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছে। তিনি লিখেন, শেষ খলীফা চীনা বংশোদ্ভূত হবেন। অর্থাৎ, তিনি মোঘলদের মধ্য হতে হবেন। তিনি জোড়া অর্থাৎ জময জন্মগ্রহণ করবেন। প্রথম মেয়ে হবে তারপরে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। এইভাবে একই সময় আমার জন্ম হয়েছে। শুক্রবার দিন প্রাতঃকালে আমি জময জন্মগ্রহণ করি। প্রথমে মেয়ে এবং পরে আমি জন্মগ্রহণ করি। জানিনা ইবনে আরাবি সাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণী কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন। এটা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর পুস্তকসমূহে এখনো এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত রয়েছে।

আমার ও হযরত মসীহের মধ্যে এই ষোলটি বিশেষত্ব রয়েছে। এখন একথা সুস্পষ্ট যদি এই ব্যাপারটি মানুষের দ্বারা হত তাহলে আমার ও মসীহের মধ্যে কখনো এতখানি অভিন্নতা থাকত না। মিথ্যারোপ করে প্রত্যাখ্যান করা আদিকাল হতে তাদেরই কাজ, যারা সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। কিন্তু এই যুগের মৌলভীদের মিথ্যারোপ অদ্ভুদ। আমি ঐ ব্যক্তি, যে নির্ধারিত সময়ে আবির্ভূত হয়েছে। কুরআন, হাদিস, বাইবেল ও অন্যান্য নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে আমার জন্য রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আমি ঐ ব্যক্তি, যার যুগে সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং কুরআন শরীফের

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই দেশে অলৌকিকভাবে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ঐ ব্যক্তি, যার যুগে সহীহ হাদিস অনুযায়ী হজ বন্ধ করা হয়েছে। আমি সেই ব্যক্তি, যার যুগে ঐ নক্ষত্রটি উদিত হয়েছে, যা মসীহ ইবনে মরিয়মের যুগে উদিত হয়েছিল। আমি সেই ব্যক্তি, যার যুগে রেলগাড়ি প্রচলনের কারণে উট বেকার হয়েছে এবং অচিরেই ঐ সময় আসছে, বরং ঐ সময় খুবই সন্নিকট যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যে রেল লাইন স্থাপিত হয়ে ঐ সকল উট বেকার হয়ে যাবে, যেগুলোতে তেরশত বছর যাবত এই সফর কল্যাণপ্রদ ছিল। তখনই উট সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের এই হাদিসটি পূর্ণ হবে, ليترکن القلاص فلايسعى عليها অর্থাৎ- মসীহের যুগে উটকে বেকার করে দেয়া হবে এবং কেউ সেগুলিতে ভ্রমণ করবে না। সেভাবেই আমি ঐ ব্যক্তি, যার হাতে শত-শত নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। পৃথিবীতে কি এমন কোন জীবিত মানুষ আছে, যে নিদর্শন প্রদর্শনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আমার উপর বিজয়ী হতে পারে? যে খোদার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে আমি তাঁর কসম খেয়ে বলছি এই যাবত আমার হাতে দুই লক্ষেরও অধিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় দশ হাজার বা তার বেশি ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছেন এবং তিনি (সা.) আমাকে সত্যায়ন করেছেন। এই দেশের কোন-কোন খ্যাতনামা আহ্‌লে কাশফ (দিব্য-দর্শী) যাদের তিন চার লক্ষ মুরীদ ছিল, তাঁদের স্বপ্নে দেখানো হয়েছে এই ব্যক্তি খোদার পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ এরূপ ছিলেন, যাঁরা আমার আবির্ভাবের ত্রিশ বছর পূর্বে এই পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। উদাহারণস্বরূপ, লুধিয়ানা জেলায় গোলাব শাহ্ নামক একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি জামালপুর জেলার মরহুম মিয়া করিম বক্সকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন, ইসা কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং লুধিয়ানায় আগমন করবেন। মিয়া করিম বক্স একজন আল্লাহ ওয়ালা বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। তিনি আমার সাথে লুধিয়ানায় সাক্ষাত করেন এবং এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে শুনান। এ জন্য মৌলবীরা তাকে অনেক কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। তিনি আমাকে বলেন, গোলাব শাহ আমাকে বলতেন, ইসা ইবনে মরিয়ম জীবিত নেই বরং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পৃথিবীতে আর ফেরত আসবেন না। মির্যা গোলাম আহমদই এই উম্মতের জন্য ইসা। খোদার কুদরত ও প্রজ্ঞা প্রথমে তাঁকে ইসার সদৃশ করেছে এবং আকাশে তাঁর নাম ইসা রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, হে করীম বক্স! যখন উক্ত ইসা আবির্ভূত হবেন, তখন মৌলভীরা তাঁর বিরোধিতা করবে। তারা কঠোর বিরোধিতা করবে কিন্তু

বিফল মনোরথ হবে। কুরআনের উপর যে সকল মিথ্যা টিকা-টিপ্পনী আরোপ করা হয়েছে, তিনি এগুলো দূর করার জন্য এবং কুরআনের প্রকৃত স্বরূপ দুনিয়াবাসীকে দেখানোর জন্য পৃথিবীতে আগমন করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উপরোক্ত বুযুর্গ দ্ব্যর্থহীনভাবে এই ইঙ্গিত করেছিলেন, তুমি এতখানি আয়ু লাভ করবে যে, তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।

এই সকল সাক্ষ্য, মুজিযা ও শক্তিশালী নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও মৌলভীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য ***"গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম"*** আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য তাদের এরূপ করাই জরুরী ছিল। স্মরণ রাখতে হবে, এই বিরুদ্ধাচরণের মূল শিকড় একটি অর্বাচীনতা। সেই অর্বাচীনতাটি হল এই: তারা মনে করে তাদের কাছে আজগুবি লক্ষণসমূহের যে ভান্ডার রয়েছে ঐ সকল লক্ষণের সবগুলি মসীহের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক এবং মসীহ ও মাহদী হওয়ার এরূপ দাবিদারকে কখনো মানা উচিত নয়, যার ক্ষেত্রে তাদের সবগুলি হাদিসের একটি হাদিসও কার্যকরী হতে বাকী থাকে–যদিও আদিকাল হতে এটা অসম্ভব ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হয়ে আসছে। ইহুদীরা যে সকল লক্ষণ হযরত ইসার জন্য নিজেদের কিতাবসমূহে নির্ধারিত করে রেখেছিল ঐগুলি পূর্ণ হয়নি। অতঃপর এই হতভাগ্যরা আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর জন্য যে সকল লক্ষণ নিধারিত করেছিল এবং বহুলভাবে প্রচার করেছিল, সেগুলি খুব কম সংখ্যকই পূর্ণ হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল আখেরী নবী বনী-ইসরাইলদের মধ্যে হতে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু আঁ–হযরত (সা.) বনী-ইসমাইলদের মধ্য হতে জন্মগ্রহণ করেন। যদি খোদা এরূপ ইচ্ছা করতেন তবে তাওরাতে লিখে দিতেন, ঐ নবীর নাম হবে মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ, দাদার নাম হবে আব্দুল মুত্তালিব, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁর হিজরতের স্থান হবে মদীনা। কিন্তু খোদাতায়ালা এটি লিখেননি। কেননা এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কিছু পরীক্ষাও প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রকৃত সত্য হলো, প্রতিশ্রুত মসীহর জন্য পূর্ব হতে সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি ইসলামের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে ন্যায়বিচারকরূপে আগমন করবেন। এটা সুবিদিত যে, প্রত্যেক ফিরকার পৃথক-পৃথক হাদিস আছে। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব, তিনি সকলের ধারণা ও বিশ্বাসের সত্যায়ন করবেন। যদি তিনি আহলে হাদিসের সত্যায়ন করেন, তবে হানাফিরা অসন্তুষ্ট হবে। যদি তিনি হানাফিদের সত্যায়ন করেন তবে শাফিরা

ক্রুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে শিয়ারা পৃথক নীতি নির্ধারণ করবে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তার আগমন হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেন? এতদ্ব্যতীত ***"ন্যায় বিচারক"*** শব্দটি স্বয়ং এটি দাবি করে, তিনি এরূপ সময়ে আগমন করবেন যখন সকল ফিরকা সত্য হতে কিছু না কিছু দূরে সরে পড়বে। এমতাবস্থায় নিজ-নিজ হাদিস দ্বারা তাঁকে যাচাই করা একটি মারাত্মক ভুল। বরং সঠিক পদ্ধতি এটাই, যে সকল নিদর্শন ও নির্ধারিত লক্ষণ তাঁর যুগে প্রকাশিত হবে ঐগুলি হতে কল্যাণ গ্রহণ করা উচিত এবং অবশিষ্ট লক্ষণগুলিকে ভ্রান্ত ও মানুষের মিথ্যা রচনা মনে করা উচিত। এই পদ্ধতিটিও ঐ সকল পুণ্য স্বভাববিশিষ্ট ইহুদীরা গ্রহণ করেছিলেন, যারা মুসলমান হয়েছিলেন। কেননা ইহুদীদের নির্দিষ্ট হাদিস অনুযায়ী যে সকল বিষয় পূর্ণ হয়েছে এবং আঁ–হযরত (সা.)-এর জন্য প্রকাশিত হয়েছে, ঐ সকল হাদিসকে তারা সহীহ মনে করল এবং যেগুলো পূর্ণ হয়নি সেগুলোকে তারা ভুল বলে আখ্যায়িত করল। যদি এরূপ না করা হত তাহলে হযরত ইসা (আ.) এর নবুওয়াত ইহুদীদের কাছে প্রমাণিত হত না এবং আমাদের নবী (সা.) এর নবুওয়াতও তাদের কাছে প্রমাণিত হত না। যে সকল ইহুদী মুসলমান হয়েছিলেন তাদের শত-শত মিথ্যা হাদিস পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। যখন তারা দেখল, একদিকে কোন-কোন নির্ধারিত লক্ষণ পূরণ হয়ে গেছে এবং অন্যদিকে খোদার রাসুলের অনুকূলে সমুদ্রসম ঐশী সাহায্য প্রবাহিত রয়েছে, তখন তারা ঐসকল হাদিস হতে কল্যাণ গ্রহণ করবেন যেগুলি পূর্ণ হয়ে গেছে। যদি তারা এরূপ না করতেন তাহলে তাদের একজনও মুসলমান হতে পারত না।

উপরোক্ত কথাগুলো আমি কয়েক দফায় মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেবকে শুনিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তিনি আমাকে বলেন, তিনি পূর্ব হতেই এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অবহিত রয়েছেন। হযরত মসীহর মৃত্যু সম্পর্কে এবং এই যুগেই ও এই উম্মতের মধ্য হতেই প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভূত হওয়া উচিত–এ সম্পর্কে তিনি আমাকে এরূপ অনেক আশ্চর্যজনক যুক্তি প্রমাণ শুনালেন যে, আমি খুব অবাক হলাম। তখন হাসান আয বাসরা বেলাল আয হাবাশের কথা আমার মনে হল। তার অধিকাংশ যুক্তিপ্রমাণ ছিল কুরআন শরীফ হতে। তিনি বার-বার বলছিলেন, ঐ সকল লোক কতই-না নির্বোধ, যারা মনে করে মসীহ মাওউদের ভবিষ্যদ্বাণী শুধুমাত্র হাদিসেই রয়েছে, যদিও কুরআন শরীফ থেকে যতখানি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন

এবং মসীহ মাওউদ এই উম্মত হতে আগমন করবেন ততখানি প্রমাণ হাদিস হতে পাওয়া যায় না। মোটকথা খোদাতায়ালা তার হৃদয়কে নিশ্চিত বিশ্বাসে ভরপুর করে দিয়েছিলেন এবং তিনি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানে এইভাবে আমাকে সনাক্ত করতেন যেভাবে এক ব্যক্তিকে ফিরিশতাসহ আকাশ হতে ***'অবতরণ'*** করতে দেখা যায়। ঐসময় হতে এই কথা আমার মনে হয়েছে, হাদিসসমূহে মসীহ মাওউদ (আ.) এর যে অবতরণের কথা বলা হয়েছে, যদিও এই শব্দটি সম্মান ও সৌজন্যের জন্য আরবদের বাগধারায় ব্যবহার করা হয়, যেমন বলা হয় অমুক সেনাবহিনী অমুক স্থানে অবতরণ করেছে, যেমন কোন শহরে নবাগতকে বলা হয় আপনি কোথায় অবতরণ করেছেন, যেমন কুরআন শরিফে আঁ-হযরত (সা.) সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, আমিই এই রাসুলকে অবতীর্ণ করেছি; যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে, ইসা (আ.) ও ইয়াহিয়া (আ.) আকাশ হতে অবতরণ করেছেন, তথাপি এই অবতরণ শব্দটি এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করছে, মসীহের সত্যতা সম্পর্কে এতখানি যুক্তি প্রমাণের সমাবেশ হবে যে, তাঁর মসীহ মাওউদ হওয়া সম্পর্কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের নিশ্চিত ও স্থির বিশ্বাস হয়ে যাবে, যেন তিনি তাদের সামনে আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। বস্তুত শাহযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ শহীদ এরূপ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের উদাহরণ দেখিয়েছিলেন। জীবন দেয়ার চাইতে অধিক বড় আর কিছু নেই এবং এরূপ দৃঢ়চিত্ততার সাথে জীবন দেয়া পরিষ্কারভাবে এই কথা বলে দিচ্ছে, তিনি আমাকে আকাশ হতে অবতরণ করতে দেখেছেন এবং অন্যান্য লোকদের জন্যও এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, আমার দাবির সকল দিক সূর্যের ন্যায় ঝলমল করছে। প্রথমত কুরআন শরিফ এই ফয়সালা করে দিয়েছে, ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) মারা গেছে এবং তিনি আর পৃথিবীতে কখনো পুনরাগমন করবেন না। যদি ধরে নেয়া হয়, কুরআন করীমের বিপক্ষে এক লক্ষ হাদিসও আছে তবে তার সবগুলোই ভ্রান্ত ও মিথ্যা এবং কোন মিথ্যাবাদী কর্তৃক বানানো। সত্য তাই–যা কুরআন বলেছে এবং ঐ সকল হাদিস মানার যোগ্য যার বিষয়বস্তু কুরআন বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী নয়। অধিকন্তু এই ফয়সালাও কুরআন শরীফেই সুরা নুরে **'মিনকুম'** (অর্থাৎ- তোমাদের মধ্য হতে) শব্দ দ্বারাই করে দিয়েছে যে, এর সকল খলীফা এই উম্মতের মধ্য হতে সৃষ্টি হবেন এবং তাঁরা মুসায়ী সিলসিলার খলীফাগণের সদৃশ হবেন এবং তাদের মধ্যে একজন সিলসিলার শেষভাগে প্রতিশ্রুত হবেন, যিনি ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) এর সাদৃশ্যযুক্ত হবেন। অন্যরা প্রতিশ্রুত হবেন না; অর্থাৎ, তাঁদের নামের উল্লেখসহ

কোন ভবিষ্যদ্বাণী থাকবে না। এই **মিনকুম** শব্দটি বুখারীতেও উল্লেখ আছে এবং মুসলিমেও উল্লেখ আছে। এর অর্থ হলো, ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ এই উম্মতের মধ্য হতে সৃষ্টি হবেন। যদি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই স্থলে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং প্রতারণামূলক পন্থা অবলম্বন না করেন, তাহলে এই তিনটি ***'মিনকুম'*** শব্দের প্রতি লক্ষ্য করলে তার বিশ্বাস হয়ে যাবে, এই বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ এই উম্মত হতেই সৃষ্টি হবেন। এখন রইল আমার দাবির বিষয়টি। কিন্তু আমার দাবির পক্ষে এতখানি যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে যে, কোন মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জ না হয় তবে যেভাবে মুহাম্মদ (সা.) এর দাবিকে মেনেছে আমার দাবিকেও সেভাবে মানা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় থাকবে না। এই যুক্তি কি আমার দাবি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমার সম্পর্কে কুরআন করীমে এতখানি পরিপূর্ণ লক্ষণ ও নিদর্শনসহ বর্ণনা রয়েছে যে, এক দিক হতে আমার নাম বলে দেয়া হয়েছে এবং হাদিসসমূহে ***'কাদয়া'*** শব্দে আমার গ্রামের নাম উল্লেখ রয়েছে? হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় এই প্রতিশ্রুত মসীহ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি প্রকাশিত হবেন। সহীহ বুখারীতে আমার চেহারা ও আকৃতির পূর্ণ বিবরণ রয়েছে এবং মসীহ সম্পর্কে যে বড় প্রাচ্যকেন্দ্র অর্থাৎ ভারতবর্ষ বুঝানো হয়েছে এবং এও লেখা হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ দামেস্ক হতে পূর্ব দিকে প্রকাশিত হবেন, তদনুযায়ী কাদিয়ান দামেস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এছাড়া আমার দাবির সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করার দিনগুলোতে রমযান মাসে আকাশে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হওয়া, পৃথিবীতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়া, হাদিস ও কুরআন অনুযায়ী রেলগাড়ির প্রবর্তন হয়ে যাওয়া, হজ বন্ধ হয়ে যাওয়া, ক্রুশের বিজয়ের সময় হওয়া, আমার হাতে শত-শত নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া, নবীগণ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহের জন্য এটাই সময় হওয়া, শতাব্দীর শিরোভাগে আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়া, আমার সত্যায়নের জন্য এটাই সময়–হাজার-হাজার পুণ্যবান ব্যক্তির এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখা, আঁ-হযরত (সা.) ও কুরআন শরীফের এই কথা বলা যে, ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ আমার উম্মতের মধ্য হতে সৃষ্টি হবেন, খোদাতায়ালার সাহায্য ও সমর্থন আমার সাথে থাকা, প্রায় দুই লক্ষ লোক আমার হাতে বয়াত গ্রহণ করে ন্যায়নিষ্ঠা ও পবিত্রতা অবলম্বন করা, আমার সময়ে খৃস্টধর্মে একটি সাধারণ আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া, এমনকি ত্রিত্ত্ববাদের যাদু বরফের মত গলতে শুরু হয়ে যাওয়া, আমার সময়ে মুসলমানরা বহু ফিরকায় বিভক্ত হয়ে তাদের পতনাবস্থা

সৃষ্টি হওয়া, বিভিন্ন ধরনের বিদাত ও শিরক এবং মদ্যপান, অবৈধ উপার্জন, আত্মসাৎ ও মিথ্যাচার বিস্তার লাভ করে পৃথিবীতে এক ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া, সবদিক থেকে এই জগতে মহান বিপ্লব সাধিত হয়ে যাওয়া, প্রত্যেক জ্ঞানীর সাক্ষ্য দ্বারা পৃথিবীর একজন সংস্কারকের মুখাপেক্ষী হওয়া, অলৌকিক বাণীতে এবং স্বীয় নিদর্শনে আমার মোকাবেলায় সকল লোকের অক্ষম ও নিরুপায় হয়ে পড়া এবং আমার সমর্থনে খোদাতায়ালার লক্ষ-লক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া, এই সকল নিদর্শন ও লক্ষণ একজন খোদাভীরুর জন্য আমাকে গ্রহণ করার জন্য কারণ হিসাবে যথেষ্ট। কোন-কোন অজ্ঞ ব্যক্তি এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করে যে, কোন-কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি, যেমন আথমের মৃত্যু এবং আহমদ বেগের জামাতা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী । কিন্তু খোদাতায়ালার কাছে তাঁদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কেননা, যে অবস্থায় কয়েক লক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হয়েছে এবং দিনের পর দিন নতুন-নতুন নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, এমতাবস্থায় তারা যদি দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করতে না পারে তবে এটা সরাসরি তাদের অন্তরের কঠোরতা। কুধারণাবশত খোদাতায়ালার হাজার-হাজার নিদর্শন, যুক্তি-প্রমাণ ও অলৌকিক ক্রিয়াকে অস্বীকার করা তাদের নিজেদেরই অপরাধ। যদি এভাবে অস্বীকার করা যায় তাহলে আমাকে এমন কোন পয়গম্বরের কথা বলে দাও, যার কোন-কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়নি।

বস্তুত মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী এর বাহ্যিক অর্থের আলোকে আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। মসীহের পূর্বে ইলিয়াস নবীর আগমন আবশ্যক ছিল। যদিও ইহুদীরা আজও তাঁর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে, তবুও তিনি কি পৃথিবীতে আগমন করেছেন? কিন্তু মসীহ আগমন করেছেন। মসীহের এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হয়েছে যে, এই যুগের লোকদের জীবদ্দশাতেই তিনি পুনরায় আগমন করবেন? তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হয়েছে যে, পিত্রসের হাতে আকাশের চাবি রয়েছে? তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হয়েছে তিনি দাউদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন? তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হয়েছে তাঁর বার জন হাওয়ারী (শিষ্য) বারটি সিংহাসনে আরোহন করবেন? তাঁর এক হাওয়ারী যিহুদা ইস্করিয়তীয় ধর্মত্যাগী হয়ে জাহান্নামে গিয়ে পড়ল, যার জন্য সিংহাসনের প্রতিশ্রুতি ছিল। তার পরিবর্তে একজন নতুন হাওয়ারীকে নির্বাচন করা হল, যা মসীহের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। হাদিসসমূহে এরূপ লিখিত আছে। বস্তুত দুররে মনসুরেও

লিখিত আছে ইউনুস নবী সুনিশ্চিতভাবে ও বিনাশর্তে এই ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন নাইনওয়ার অধিবাসীদের উপর চল্লিশদিনের মধ্যে আযাব নাযিল হবে, যা তাদেরকে এই মেয়াদকালের মধ্যে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু তাদের উপর কোন আযাব নাযিল হয়নি এবং তারা ধ্বংসও হয়নি! অবশেষে ইউনুসকে (আ.) লজ্জিত হয়ে ঐ স্থান হতে পলায়ন করতে হল। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে ইউহান্না নবীর কিতাবে উল্লেখ আছে যাকে খৃষ্টানেরা খোদাতায়ালার পক্ষ হতে মনে করে। এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা এ সকল নবীর উপর ইমান রাখে এবং এই সকল আপত্তির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু উপরোল্লিখিত যে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে, অর্থাৎ আথম সম্বন্ধে ও আহমদ বেগের জামাতা সম্বন্ধে তাদের আপত্তি রয়েছে, এই ব্যাপারে আমি বার বার লিখেছি, আথমের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ সুস্পষ্টতার সাথে পূর্ণ হয়েছে। এখন খুঁজে দেখ আথম কোথায় আছে! সে কি জীবিত আছে না কি মরে গেছে? ভবিষ্যদ্বাণীর সার সংক্ষেপ এই ছিল আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর পূর্বে মারা যাবে। সুতরাং অনেক দিন গত হয়েছে আথম মারা গেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এই কথাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে আথম পনর মাসের মধ্যে মারা যাবে–যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে; এই শর্তটি এর সাথে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু আথম ঐ বিতর্ক সভাতেই নিজ বেয়াদবী হতে প্রত্যাবর্তন করেছিল। কেননা, যখন আমি তাকে বললাম এই ভবিষ্যদ্বাণী এই জন্য করা হয়েছে, তুমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নিজ পুস্তকে 'দাজ্জাল' লিখেছ। এইকথা শুনা মাত্রই তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং নিতান্ত বিনয়ের সাথে সে নিজের জিহ্বা বের করল এবং দুই হাত দিয়ে নিজের দুই কান ধরে বলল, আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানে কখনও এমন কথা বলিনি এবং সে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করল। এই সময় ষাটের অধিক মুসলমান এবং খৃস্টান ও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিল। এটি কি এই রূপ কথা ছিল না–যাকে দাম্ভিকতা ও বেয়াদবী হতে প্রত্যাবর্তন মনে করা যেতে পারে? এছাড়াও সে পনর মাস পর্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত রইল এবং অধিকাংশ সময় কান্নাকাটি ও গিরীয়াজারীর মধ্যে অতিবাহিত করল এবং নিজের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করল। অতএব একজন পূণ্য-হৃদয়বিশিষ্ট ইমানদার ব্যক্তির জন্য এই কথা যথেষ্ট যে, সে পনর মাসের মধ্যে কিছুটা নিজেকে পরিবর্তন করেছিল। এছাড়া যেহেতু সে খোদাতায়ালার কাছে ভীত হয়ে নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করল এবং দাম্ভিকতা

ও বেয়াদবী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করল বরং অমৃতসরে যেসব লোকের সাথে তার উঠাবসা ছিল, তাদের সংস্পর্শ পরিহার করে এবং অমৃতসরের বাড়ি পরিত্যাগ করে সে ফিরোজপুর বসতি স্থাপন করে সেহেতু এরূপ ভীতি হতে তার উপকৃত হওয়া জরুরী ছিল। সুতরাং যদিও এই কথাটি পূর্ণ হল যে, সে আমার পূর্বে খুব শীঘ্র ঐ দিনগুলিতেই মারা গেল কিন্তু শর্ত কিছুটা পূর্ণ করার দরুণ উপকৃত হল। এর বিপরীত লেখরাম ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদকালে কোন বিনয় ও ভীতি প্রকাশ করেনি বরং পূর্বের চাইতেও অধিক বেয়াদবীর মানসিকতায় সে বাজারে ও অলি–গলিতে শহরে ও গ্রামে–গঞ্জে ইসলামের অবমাননা করতে লাগল। এই কারণে সে মেয়াদকালের মধ্যেই নিজের এই কুকর্মের দরুণ পাকড়াও হল এবং গালিগালাজ ও অশ্লীলতায় তার যে জিহ্বা ছুরির ন্যায় চলছিল ঐ ছুরিই তাকে শেষ করল।

এখন বাকী রইল আহমদ বেগের জামাতার কথা। প্রত্যেকে অবগত আছেন এ ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল ব্যক্তি সম্বন্ধে। তাদের একজন হল আহমদ বেগ এবং অন্যজন হল তার জামাতা। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ মেয়াদ কালের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেল। অর্থাৎ, আহমদ বেগ মেয়াদ কালের মধ্যেই মরে গেল। এভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ মেয়াদ কালের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর অন্য অংশটি সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় তা সততার সাথে উত্থাপন করা হয় না। আজ পর্যন্ত কোন আপত্তিকারীর মুখ হতে আমি এ কথা শুনিনি সে এভাবে আপত্তি করে যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পূর্ণ হয়েছে এবং আমি খাঁটি অন্তঃকরণে স্বীকার করি তা পূর্ণ হয়েছে কিন্তু অন্য অংশটি আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। বরং আপত্তিকারীরা ইহুদীদের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়া অংশ সম্পূর্ণরূপে গোপন রেখে আপত্তি উত্থাপন করে। এরূপ নীতি কি ইমানে লজ্জা-শরম এবং ন্যায় নিষ্ঠার সমর্থক? তাদের অসাধু আপত্তির উত্তর হলো, এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও ছিল আথমের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ, এই শর্তে লেখা হয়েছিল, যদি তাদের উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভয়-ভীতির অভিব্যক্তি না করে তাহলে ভবিষ্যদ্বাণীটি মেয়াদ কালের মধ্যে পূর্ণ হবে! আহম বেগ ভয় ভীতি প্রকাশ করেনি এবং সে ভবিষ্যদ্বাণীটিকে ঘটনার বিপরীত মনে করছিল। কিন্তু আহমদ বেগের জামাতা এবং তার আত্মীয় পরিজনেরা ভীত হয়ে পড়ছিল। কেননা আহমদ বেগের মৃত্যু তাদের হৃদয়ে এক কম্পন সৃষ্ট করে দিয়েছিল। যেমন মানুষের স্বভাব, কঠোর হতে কঠোরতর মানুষ নিদর্শন

দেখার পর নিশ্চয় ভীত হয়ে পড়ে। অতএব তাকেও অবকাশ দেয়া জরুরী ছিল। সুতরাং এই সকল আপত্তি অজ্ঞতা দৃষ্টিহীনতাও বিদ্বেষপ্রসূত। তা ন্যায় নিষ্ঠা ও সত্যান্বেষণ হতে উদ্ভুত নয়। যে ব্যক্তির হাতে অদ্যাবধি দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে−যদি কোন অজ্ঞ এবং কুধারণা পোষণকারী দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করতে না পারে, তবে কি এতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক নয়? আমি এই কথা নিশ্চিত ওয়াদাসহ লিখেছি যদি কোন বিরুদ্ধবাদী, সে খৃষ্টানই হোক বা তথাকথিত মুসলমানই হোক যদি সে প্রমাণ করতে পারে যে ভবিষ্যদ্বাণী গুলোর মোকাবেলায় যিনি আকাশ হতে অবতরণ করবেন বলে মনে করা হয় তার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সুস্পষ্টতা এবং বিশ্বাস ও স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমি তাকে নগদ এক হাজার টাকা প্রদান করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রমাণ করার এই পদ্ধতি হবে না যে, কুরআন শরীফ পেশ করে বলবে কুরআন করীম হযরত ইসা (আ.)-কে নবী বলে স্বীকার করেছে অথবা তাকে নবী সাব্যস্ত করেছে। কেননা এভাবে তো আমিও জোরের সাথে দাবি করছি কুরআন শরীফ আমার সত্যতার সাক্ষী। সমগ্র কুরআন শরীফে কোথাও "ইসু" শব্দটি নেই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে **'মিনকুম'** (তোমাদের মধ্য হতে-অনুবাদক) শব্দটি উল্লেখিত আছে এবং আরও অনেক লক্ষণ রয়েছে। বরং এস্থলে আমার বলার উদ্দেশ্য কেবল এটিই কুরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কেবলমাত্র আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর এবং ইসার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উপর আদালতের সাধারণ অনুসন্ধানের রীতিতে দৃষ্টিপাত করা হোক এবং দেখা যাক, এই দুই ব্যক্তি কোন-কোন ভবিষ্যদ্বাণী অথবা তাদের অধিকাংশ বুদ্ধির বিচারে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে পূর্ণ হয়েছে এবং কোনগুলি এই গুণগত মানের সাথে পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ, এই অনুসন্ধান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এভাবে হওয়া উচিত যে, যদি কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফের অস্বীকারকারী হয় সেও যেন রায় দিতে পারে প্রমাণের জোর কোন দিকে আছে।

এছাড়াও এস্থলে আমার আক্ষেপ হয়, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের মুসলমানতো বলে, কিন্তু তারা ইসলামের নীতি সম্বন্ধে অবহিত নয়। ইসলামে এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, ভীতি প্রদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এটি জরুরী নয় যে, খোদা একে পূর্ণ করবেন। অর্থাৎ, যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়বস্তু এই কোন ব্যক্তি বা দলের উপর কোন বিপদ আপতিত হবে তাতে এটাও সম্ভব যে,

খোদাতায়ালা উক্ত বিপদকে অপসারণ করেননি যেমন ইউনুস নবীর ভবিষ্যদ্বাণী যা চল্লিশ দিন পর্যন্ত সীমিত ছিল তা অপসারণ করা হয়। কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণীতে ওয়াদা থাকে অর্থাৎ, কোন মহান পুরস্কার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী থাকে তা কোনভাবেই অপসারিত হতে পারে না। খোদাতায়ালা বলেন

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

(আল্লাহ কখনো স্বীয় ওয়াদা ভঙ্গ করেন না-সুরা আল ইমরান:১০- অনুবাদক)। সুতরাং এতে এই গুঢ় রহস্য নিহিত আছে ভীতি প্রদর্শনশূলক ভবিষ্যদ্বাণী ভয় এবং দোয়া ও সদকা খয়রাতের দ্বারা অপসারিত হতে পারে। সকল নবী এই বিষয়ে একমত, সদকা, দোয়া ও ভয়-ভীতির দ্বারা ঐ বিপদ যে সম্পর্কে খোদা জ্ঞাত এবং যা কোন ব্যক্তির উপর নিপতিত হবে তা অপসারিত হতে পারে। এখন ভেবে দেখা দরকার প্রত্যেক বিপদ যার সম্বন্ধে খোদা জ্ঞাত যদি সে সম্পর্কে কোন নবী বা ওলীকে অবহিত করা হয় তাহলে এর নাম ঐ সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী হবে যখন উক্ত নবী বা ওলী অন্য সকলকে এই বিপদ সম্পর্কে অবহিত করেন। এটি সপ্রমাণিত, বিপদ অপসারিত হতে পারে। অতএব নিশ্চিতভাবে এই ফল দাঁড়াল এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী যা কোন বিপদ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে সংবাদ দিয়ে থাকে-তা পূর্ণতা লাভ করতে বিলম্ব হতে পারে।

এরপর আমি আমার পূর্বের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখছি মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব যখন কাদিয়ানে আসেন তখন তিনি কেবলমাত্র এই ফায়দাই লাভ করেননি যে, তিনি বিস্তারিতভাবে আমার দাবির যুক্তি প্রমাণসমূহ শ্রবণ করেন বরং তিনি যে কয়েক মাস আমার সাথে কাদিয়ানে ছিলেন এবং ঝিলাম পর্যন্ত তিনি আমার সাথে এক সফরও করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি আমার সমর্থনে স্বর্গীয় নিদর্শনগুলিও প্রত্যক্ষ করলেন। এসব দলিল প্রমাণ জ্যোতি ও অলৌকিক নিদর্শন দেখার ফলে তিনি এক অসাধারণ বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে গেলেন এবং ঊর্ধ্বতন শক্তি তাকে আকর্ষণ করে নেয়। আমি কোন এক উপলক্ষ্যে একটি আপত্তির উত্তরও তাঁকে বুঝিয়েছিলাম। তাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বিষয়টি হলো, যে অবস্থায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসার সদৃশ এবং তার খলীফাগণ বনী ইসরাইলের নবীগণের সদৃশ তাহলে কি কারণে মসীহ মাওউদকে না হাদিস শরীফে নবী বলে সম্বোধান করা হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য খলীফাগণকে এই নামে আখ্যায়িত করা হয়নি? সুতরাং

আমি তাকে এই উত্তর দিলাম যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুল আম্বিয়া ছিলেন এবং তার পরে কোন নবী ছিলেন না এজন্য যদি সকল খলীফাকে নবী নামে ডাকা হত তাহলে সাদৃশ্যহীনতার আপত্তি থেকে যেত। কেননা মুসার খলীফাগণ নবী ছিলেন না। এজন্য আল্লাহতায়ালার প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী খত্‌মে নবুওয়তের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক খলীফাকে প্রেরণ করা হয় কিন্তু তাদের নাম নবী রাখা হয় নাই এবং এই মর্যাদা তাদেরকে প্রদান করা হয়নি যাতে খতমে নবুওয়াতের উপর এটি নিদর্শন স্বরূপ থাকে। অতঃপর শেষ খলীফা, অর্থাৎ–মসীহ মাওউদকে নবীর নামে সম্বোধন করা হয় যাতে খিলাফতের ক্ষেত্রে উভয় সিলসিলার সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়।

আমি কয়েকবার বর্ণনা করেছি মসীহ মাওউদের নবুওয়াত প্রতিচ্ছায়ারূপ নবুওয়াত। কেননা তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছায়া হওয়ার অধিকারী হয়েছেন। যেমন এক ওহীতে খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন আহাদ জুয়েলতা মুরসালা। হে আহাদ! তোমাকে রাসুল বানানো হয়েছে। অর্থাৎ যদিও তোমার নাম গোলাম আহমদ ছিল তবুও তুমি প্রতিচ্ছায়ারূপে আহমদের নামের অধিকারী হয়েছ। সুতরাং এরূপে তুমি প্রতিচ্ছায়ারূপে নবীর নামের অধিকারী। কেননা আহমদ একজন নবী এবং নবুওয়ত তাঁর থেকে আলাদা হতে পারে না। হাদিসে বর্ণিত আছে, মসীহ মাওউদ দুটি হলুদ রঙের চাদর পরিধান করে অবতীর্ণ হবেন। একটি চাদর তাঁর দেহের উপরের অংশে থাকবে এবং অন্য চাদরটি তাঁর দেহের নীচের অংশে থাকবে। সুতরাং আমি বললাম, এটা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করছে, মসীহ মাওউদ দু'টি ব্যাধি নিয়ে অবতীর্ণ হবেন। কেননা তাবীর শাস্ত্রে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বই-চলতিকারক) হলুদ কাপড়ের অর্থ হল ব্যাধি এবং এই দু'টি ব্যাধি আমার আছে। অর্থাৎ, একটি হল মস্তিষ্কের ব্যাধি এবং দ্বিতীয়টি প্রস্রাবের আধিক্য ও পেটের পীড়া। তিনি (সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব-অনুবাদক) তখন এখানেই অবস্থান করছিলেন যখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং গভীর পরিবর্তনের ফলে তাঁর কাছে ইলহাম ও ওহীর দরজা খুলে দেয়া হল। তিনি খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার সত্যায়ন সম্পর্কে শাহাদাতের সংবাদ প্রাপ্ত হন। যার ফলে তিনি অবশেষে এই শাহাদাতের শরবত নিজের জন্য গ্রহণ করেন। এখন এটি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার সময় হয়েছে। নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো! যেভাবে তিনি আমার সত্যায়নের পথে

মৃত্যুকে গ্রহণ করেন এই ধরনের মৃত্যু ইসলামের তেরশত বছরের ইতিহাসে সাহাবাগণের (রা.) উদাহরণ ব্যতীত অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। অতএব নিঃসন্দেহে এভাবে তার মৃত্যু বরণ করা এবং আমার সত্যায়নে নিজ প্রাণ খোদাতায়ালার নিকট সমর্পণ করা এটি আমার সত্যতার এক অতি মহান নিদর্শন। কিন্তু এটি তাদের জন্য, যাদের বুদ্ধি জ্ঞান আছে। মানুষ কখনও কি সন্দেহ ও সংশয়ের অবস্থায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করতে চায়? এছাড়াও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই বুযুর্গ কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কাবুল রাজ্যে তার কয়েক লক্ষ টাকার জায়গীর ছিল এবং ইংরেজ রাজ্যেও তার অনেক জমি ছিল। তার জ্ঞানের শক্তি এই পর্যায়ের ছিল যে, সরকার তাকে সকল মৌলবীর নেতা করে দিয়েছিলেন। কুরআন, হাদিস এবং ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানের দিক হতে তাকে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম মনে করা হতো। নতুন আমীরের অভিষেক অনুষ্ঠান তার হাতে সম্পন্ন হয়েছিল এবং আমীরের মৃত্যু হলে তার জানাযা পড়ার জন্যও তিনিই মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে এ সকল কথা আমার কাছে পৌঁছেছিল। তার নিজের মুখ হতেও আমি শুনেছিলাম কাবুল রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ তার শিষ্য ও ভক্ত ছিল, যাদের মধ্যে কেউ-কেউ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন। মোটকথা এই বুযুর্গ কাবুলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জ্ঞানের দিকেই বলুন, খোদাভীতির দিক হতেই বলুন, সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক হতেই বলুন এবং বংশ মর্যাদার দিক হতেই বলুন ঐ দেশের কেউ তার সমতুল্য ছিল না। মৌলভী পদবী ছাড়াও তিনি ঐ দেশে সাহেবযাদা আখওয়ান্দযাদা এবং শাহযাদা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। মহীদ মরহুমের হাদিস, তফসির, ফিকাহ শাস্ত্র এবং ইতিহাসের একটি বড় গ্রন্থাগার ছিল। তিনি নতুন-নতুন পুস্তক ক্রয় করার ক্ষেত্রে সদা সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। তিনি সর্বদা শিক্ষা-দীক্ষার চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন এবং শত-শত মানুষ তার শিষ্যত্বের গৌরব অর্জন করে মৌলভী পদবী লাভ করতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আমিত্বহীনতা ও বিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি এই পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে, ফানাফিল্লাহ (আল্লাহ–তে বিলীন প্রাপ্ত) না হলে কেউ এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ সুনাম এবং জ্ঞানের কারণে কিছুটা আত্মহারা হয়ে যায় এবং নিজেকে কিছু একটা ভাবতে থাকে এবং এই জ্ঞান ও সুনামই তার সত্যান্বেষণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ব্যক্তি এরূপ আমিত্বহীন ছিলেন যে, আল্লাহতায়ালার আশীষ ও ফযলরাশির এক মূর্তিমান প্রতীক হওয়া

সত্ত্বেও তার জ্ঞান আমল ও বংশ মর্যাদা প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশেষে তিনি সত্যের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন করেন এবং আমার জামাতের জন্য এরূপ একটি উদাহরণ রেখে গেছেন–যা অনুসরণ করা খোদার প্রকৃত ইচ্ছা। এখন আমি নিম্নে এই বুযুর্গের শাহাদাতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করছি, কিরূপ বেদনাদায়ক পন্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই পথে তিনি কিরূপ দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেছিলেন। ইমানের পরিপূর্ণ শক্তি ব্যতীত এই অহংকারের জগতে কেউ এরূপ দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করতে পারে না। অবশেষে আমি এটাও লিখব, এরূপ হওয়াই জরুরী ছিল। কেননা, আজ হতে তেইশ বৎসর পূর্বে তার শাহাদাত এবং তার এক শিষ্যের শাহাদাত সম্পর্কে খোদাতায়ালা আমাকে সংবাদ দান করেছিলেন। এটি আমি ঐ যুগেই বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলাম। অতএব এই মরহুম বুযুর্গ না কেবল ঐ নিদর্শন দেখিয়েছেন যা পরিপূর্ণ দৃঢ়চিত্ততার উদাহরণরূপে তার কাছ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বরং এই দ্বিতীয় নিদর্শনও তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল–যা এক সুদীর্ঘকালের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। ইনশাল্লাহ আমি পরিশেষে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করব।

প্রকাশ থাকে 'বারাহীনে আহমদীয়া'-য় লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী দু'টিতে শাহাদাতের উল্লেখ আছে। প্রথম শহীদ হলেন মিয়া আব্দুর রহমান। তিনি পূর্বোক্ত মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। মিয়া আব্দুর রহমানের শাহাদাত আমীর আব্দুর রহমানের, অর্থাৎ এই আমীরের পিতার দ্বারা কার্যকর হয়েছিল। এজন্য আমি সময়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী প্রথমে মরহুম মিয়া আব্দুর রহমানের শাহাদাত সম্পর্কে বর্ণনা করছি।

# আফগানিস্তানের খোসত এলাকার প্রধান মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেবের অনুসারী মরহুম মিয়া আব্দুর রহমানের শাহাদাতের বিবরণ

মরহুম মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেবের শাহাদাতের আনুমানিক দুই বছর পূর্বে তার ইশারা ও আদেশে তার সুযোগ্য শিষ্য মিয়া আব্দুর রহমান সম্ভবত দুই তিন বার কাদিয়ানে আসেন। প্রত্যেকবার তিনি কয়েক মাস পর্যন্ত কাদিয়ানে অবস্থান করেন এবং অবিরত সংস্পর্শ ও শিক্ষা এবং যুক্তি প্রমাণ শ্রবণের ফলে তার ইমান শহীদের রঙ ধারণ করল। যখন তিনি শেষবারের মত কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি আমার শিক্ষার সবটাই গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে তার কাদিয়ান অবস্থানকালে জেহাদ নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল–যার ফলে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই জামাত জেহাদের বিরোধী। এরপর এরূপ ঘটল, যখন তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেশোয়ার পৌঁছেন তখন ঘটনাক্রমে পেশোয়ারে অবস্থানরত আমার মুরীদ উকিল খাজা কামাল উদ্দিন সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ঐ সময় খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব জেহাদ নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এটাও পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটি তাঁর হৃদয়ে এইভাবে গেঁথেছিল যে, কাবুলে গিয়ে তিনি এই কথা যত্রতত্র বলতে আরম্ভ করেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ঠিক নয়। কেননা তারা মুসলমানদের একটি বড় দলের সমর্থক এবং কয়েক কোটি মুসলমান তাদের আশ্রয়ে নিরাপদ ও শান্তিতে জীবন যাপন করছে। এরপর ধীরে-ধীরে এই সংবাদ আমীর আব্দুর রহমানের নিকট পৌঁছে গেল। এটা কোন কোন দুষ্ট প্রকৃতির পাঞ্জাবী যারা তার সাথে চাকুরীর সুবাদে সম্পর্কিত ছিল তারা আমীরকে বুঝালো, ইনি পাঞ্জাবের এক ব্যক্তির মুরীদ যিনি নিজেকে মসীহ মাওউদ বলে প্রচার করেন এবং তিনি এই শিক্ষাও দিয়ে থাকেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ঠিক নয়। বরং তিনি এই যুগে জেহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমীর এই কথা শুনে খুবই ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন, যাতে অনুসন্ধান করে অতিরিক্ত কিছু জানা যেতে পারে। অবশেষে এটি সত্য প্রতিপন্ন হল যে,

নিশ্চয় এই ব্যক্তি মসীহ্ কাদিয়ানীর মুরীদ এবং জেহাদের বিরোধী। তখন এই মযলুমকে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে শহীদ করা হল। কথিত আছে, তাঁর শহাদাতের সময় কয়েকটি আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল।

এটি তো হল মিয়া আব্দুর রহমান শহীদের কাহিনী। এখন মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফের শাহাদাতের বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণনা করছি এবং আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন এই ধরনের ইমান লাভের জন্য দোয়া করতে থাকেন; কেননা যতদিন মানুষ কিছুটা খোদার এবং কিছুটা দুনিয়ার থাকে ততদিন আকাশে তার নাম মুমিনরূপে আখ্যায়িত হয় না।

# কাবুলের খোসত এলাকার মহান নেতা মরহুম মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব গাফারাল্লাহু লাহু (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার বিবরণ

আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, মৌলভী সাহেব কাবুলের খোসত এলাকা হতে কাদিয়ানে এসে কয়েক মাস আমার সংস্পর্শে অবস্থান করেন। এরপর যখন আকাশে এটি চূড়ান্তভাবে ফয়সালা হয়ে গেল। তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন তখন তাঁর জন্য এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে গেলেন। বিশ্বস্ত সূত্রে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে এখন আমি জানতে পারলাম খোদার অমোঘ ও অবধারিত বিধানে মৌলভী সাহেব যখন কাবুল এলাকার কাছে পোঁছেন তখন তিনি ইংরেজ শাসিত এলাকায় আবস্থান করে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হোসেন (যিনি তাঁর শিষ্য ছিলেন) একটি চিঠি লিখেন এবং জানান, যদি আপনি আমীর সাহেবের কাছ থেকে আমার যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আমাকে সংবাদ দেন তাহলে আমি কাবুল গিয়ে আমীর সাহেবের কাছে উপস্থিত হব। তিনি বিনা অনুমতিতে এজন্য যাননি যে, সফরের সময় আমীর সাহেবকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমি হজে যাচ্ছি। কিন্তু কাদিয়ানে দীর্ঘদিন অবস্থান করার ফলে তার এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারল না এবং ইতোমধ্যেই সময় ফুরিয়ে গেল। আর যেহেতু তিনি আমাকেই প্রতিশ্রুত মসীহ বলে সনাক্ত করেছিলেন, সেহেতু আমার সংস্পর্শে থাকাটাই তার নিকট শ্রেয় মনে হয়েছিল এবং আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসুলা (সুরা নিসা: ৬০) –দলিল অনুযায়ী তিনি হজের ইচ্ছা পরবর্তী কোন বৎসরে স্থানান্তর করেন। প্রত্যেক হৃদয় এটি অনুধাবন করতে পারে যে হজের আকাঙ্খা পোষণকারী কোন ব্যক্তির সম্মুখে যদি এই বিষয়টি এসে পড়ে, তিনি ঐ প্রতিশ্রুত মসীহকে দর্শন করেন যার জন্য তেরশত বছর ধরে ইসলামের অনুসারীরা অপেক্ষমান তাহলে কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল অনুযায়ী তিনি তাঁর অনুমতি ব্যতীত হজে যেতে পারেন না। অবশ্য তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্য কোন সময়ে হজে যাওয়া যেতে পারে।

মোটকথা, যেহেতু ঐ মরহুম সৈয়্যদুশ শুহাদা (শহীদগণের নেতা) নিজ সদিচ্ছার দরুন হজ সম্পাদন করতে পারেন না এবং কাদিয়ানে সময় অতিবাহিত হয়ে গেল সেহেতু তিনি কাবুলে পৌঁছার এবং সীমান্তে পা রাখার পূর্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এটি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন যে, ইংরেজ শাসিত এলাকায় থেকে কাবুলের আমীরের কাছে নিজ ইতিবৃত্ত প্রকাশ করবেন কিভাবে হজ সম্পাদন করতে তিনি অক্ষম হলেন। ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হোসেনকে চিঠি লেখাটাই তিনি যুক্তি সঙ্গত মনে করলেন, যাতে তিনি সুযোগমত সঠিক ভাষায় এটি আমীরের কর্ণগোচর করেন। উক্ত চিঠিতে তিনি লিখেন, যদিও আমি হজ করতে রওয়ানা হয়েছিলাম কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে আমার সাক্ষাত হয়ে গেল এবং যেহেতু মসীহের সাথে সাক্ষাত করার জন্য এবং তাঁর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য খোদা ও রাসুলের আদেশ রয়েছে, আমাকে তাই কাদিয়ানে অবস্থান করতে হয়েছিল। আমি নিজের পক্ষ হতে নয়, বরং কুরআন ও হাদিসের আলোকে এটা করা জরুরী মনে করেছিলাম। এই চিঠি যখন পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকতা ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হোসেনের কাছে পৌঁছল তখন তিনি চিঠিটি নিজের হাঁটুর নীচে রেখে দিলেন এবং ঐ সময় তা আমীরের কাছে উপস্থাপন করলেন না। কিন্তু তার সহকারী ছিল একজন বিরুদ্ধবাদী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এটা যে মৌলভী সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেবের চিঠি এবং তিনি কাদিয়ানে অবস্থান করেছেন, সে কোন একভাবে তা জেনে ফেলল। তখন সে কোন এক কৌশলে চিঠিটি বের করল এবং আমীর সাহেবের কাছে পেশ করল। আমীর সাহেব পুলিশ কর্মকর্তা ব্রিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেন এই চিঠি তার নামে এসেছে কিনা। তিনি আমীরের রোষ ও ক্রোধে ভীত হয়ে অস্বীকার করেন। এরপর মৌলভী সাহেব শহীদ পূর্বের চিঠির উত্তরের অপেক্ষা করে আরো একটি চিঠি ডাকযোগে পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেনের কাছে প্রেরণ করেন। পোস্ট অফিসের কর্মকর্তা চিঠি খুলেন এবং আমীর সাহেবের কাছে পৌঁছে দেন। যেহেতু আল্লাহতায়ালার অমোঘ ও অবধারিত বিধানে মৌলানা সাহেবের অদৃষ্টে শাহাদাত লিপিবদ্ধ ছিল সেহেতু আমীর সাহেব তাকে ডেকে আনার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করেন এবং তাকে চিঠি দিলেন আপনি চলে আসুন। যদি এই দাবি সত্য হয় তাহলে আমিও মুরীদ হয়ে যাব। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এটি অবগত নই, আমীর চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করেছিলেন, নাকি লোক মারফত প্রেরণ করেছিলেন। যাহোক সেই চিঠি পাওয়ার পর এই মৌলভী সাহেব কাবুলে রওয়ানা হলেন এবং খোদার অমোঘ

ও অবধারিত বিধান প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো। বর্ণনাকারীরা বলেন, মরহুম শহীদ কাবুলের রাস্তা অতিক্রম করার সময় ঘোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার পশ্চাতে আটজন সরকারী ঘোড় সওয়ার ছিল এবং তার আগমনের পূর্বে সাধারণভাবে কাবুলে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে আমীর সাহেব আখওয়ান্দযাদা সাহেবকে প্রতারণাপূর্বক ডেকে আনিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, যখন মরহুম আখওয়ান্দযাদা সাহেব বাজার অতিক্রম করছিলেন, তখন আমরা এবং বাজারের আরো অনেক লোক তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। তারা বর্ণনা করেন আটজন সরকারী ঘোড় সওয়ার খোসত হতেই তার সঙ্গী হয়েছিল। কেননা, খোসতে পোঁছার পূর্বেই তাকে গ্রেফতার করার জন্য সরকারী আদেশনামা খোসতের শাসনকর্তার নামে পোঁছে গিয়েছিল।

মোটকথা, যখন তাকে আমীর সাহেবের সম্মুখে হাজির করা হল তখন তিনি খুবই অন্যায় আচরণ করেন। কেননা বিরুদ্ধবাদীরা পূর্ব হতেই তাকে অত্যন্ত বিগড়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, এর কাছ থেকে আমি দুর্গন্ধ পাচ্ছি। একে দূরে দাঁড় করাও। অল্প কিছুক্ষণ পরে তিনি আদেশ দেন, একে এই দুর্গে বন্দী করে রাখ–যে দুর্গে স্বয়ং আমীর থাকেন এবং আপাদমস্তক শিকলে আবদ্ধ কর। এই শিকল এক মণ চব্বিশ সের ওজনের ছিল। এটি ঘাড় হতে কোমর পর্যন্ত বেষ্টিত থাকে এবং হাতকড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও আদেশ দেন, এর পায়ে আট সের ওজনের শিকল দাও। এরপর মরহুম মৌলভী সাহেব চার মাস জেলে থাকেন এবং এই সময়ে কয়েকবার তাকে আমীর সাহেব ডেকে বলেন, যদি তুমি এই ধারণা ত্যাগ কর যে, কাদিয়ানী প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুত মসীহ্ নয় তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু প্রতিবার তিনি এই উত্তরই প্রদান করেন : আমার জ্ঞান আছে এবং খোদা আমাকে সত্য ও মিথ্যা সনাক্ত করার সামর্থ দান করেছেন। আমি পূর্ণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুত মসীহ–যদিও আমি জানি এই কথা বিশ্বাস করার দরুণ আমার জীবন বিপন্ন হবে এবং আমার পরিবার-পরিজন ধ্বংস হবে, তবুও আমি আমার ইমানকে আমার প্রাণ এবং সকল পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর শ্রেয় মনে করি। মরহুম শহীদ একবার নয়, বরং বন্দী অবস্থায় বার-বার একই উত্তর প্রদান করেন। এই জেলখানা ইংরেজদের জেলখানার মত ছিল না, যেখানে মানবিক দুর্বলতার প্রতি কিছুটা লক্ষ্য রাখা হয়। বরং এটা একটি ভয়ংকর জেলখানা ছিল, যাকে মানুষ মৃত্যুর চাইতেও জঘন্য মনে করে। এজন্য

লোকেরা উপরোক্ত শহীদের এই দৃঢ়-চিত্ততা ও অটল মনোবলকে অত্যন্ত অবাক দৃষ্টিতে দেখল। বস্তুত অবাক হওয়ার কারণ ছিল। কেননা, এরূপ মর্যাদাশালী ব্যক্তি, কাবুলে যার কয়েক লক্ষ টাকার জায়গীর ছিল এবং জ্ঞান ও তাকওয়ার (খোদাভীরুতার) ঐশ্বর্যের দরুন যিনি সমগ্র কাবুল ভূখন্ডের নেতা ছিলেন এবং যিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সুখ-সম্পদ ও বিলাসী জীবন যাপন করেন এবং যার বিরাট পরিবার-পরিজন ও প্রিয় পুত্র সন্তান ছিল, তাকে এভাবে ভয়ংকর জেলখানায় রাখা হল, যা মৃত্যুর চাইতেও মারাত্মক ছিল। যার কথা কল্পনা করলেও শরীর শিউরে ওঠে। এরূপ কোমল শরীর নেয়ামতে লালিত মানুষ অন্তরাত্মা কম্পনকারী জেলখানায় ধৈর্যের সাথে অবস্থান করেন এবং স্বীয় প্রাণকে ইমানের জন্য বিলীন করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কাবুলের আমীরের পক্ষ হতে বার-বার তার কাছে পয়গাম আসছিল, ঐ কাদিয়ানী ব্যক্তির দাবির সত্যায়নকে অস্বীকার করলে তোমাকে এই মুহুর্তে সসম্মানে মুক্ত করে দেয়া হবে। এরপরও এই শক্তিশালী ইমানদার বুযুর্গ উপর্যুপরি প্রতিশ্রুতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেননি এবং প্রতিবার এই উত্তরই প্রদান করেন, আমার কাছে এই আশা করবেন না, আমি পার্থিব বস্তুকে ইমানের উপর প্রাধান্য দান করি। তিনি আরও বলেন, যাকে আমি সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করেছি এবং সর্বতোভাবে তাঁর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি, কিভাবে সম্ভব যে, নিজের মৃত্যুর ভয়ে তাঁকে অস্বীকার করব? তাঁকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি দেখছি, আমি সত্য পেয়েছি। এজন্য অল্প কয়েকদিনের জীবনের জন্য আমার পক্ষে এই বে–ইমানী করা সম্ভব নয় যে, আমি এই প্রমাণিত সত্যকে পরিত্যাগ করব। আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি এবং এটিই আমার শেষ কথা। ঐ বুযুর্গের বারবার একই জবাবের জন্য, কাবুল ভূখন্ডের মানুষ কখনও তাকে ভুলবে না এবং কাবুলের লোকেরা তাদের সারা জীবনে ইমানদারী ও দৃঢ়–চিত্ততার এই দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে কখনও দেখেনি। এস্থলে এ-ও উল্লেখযোগ্য, বার-বার ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি ধর্ম–বিশ্বাস ত্যাগ করানোর জন্য মনযোগ আকর্ষণ করা কাবুলের আমীরদের রীতি নয়। কিন্তু মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব মরহুমকে এই বিশেষ অনুগ্রহ এজন্য করা হয়েছিল, তিনি আমীরের দৃষ্টিতে এত বড় বিজ্ঞ আলেম ছিলেন যে, তাকে আলেমকূলের সূর্য মনে করা হতো। সুতরাং এ-ও হতে পারে স্বয়ং আমীরের মনে এই দুঃখ ছিল, আলেমদের সর্ববাদীসম্মত রায় অনুযায়ী এরূপ মহান মানুষটিকে নিশ্চয় হত্যা করা হবে। এ-ও সত্য, আজকাল একদিক হতে কাবুল সরকারের লাগাম

মৌলভীদের হাতে রয়েছে এবং যেই বিষয়েই উপর মৌলভীরা একমত হয়, তার বিপরীত কিছু করা আমীরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং এটি বোধগম্য যে, একদিকে আমীর মৌলভীদের ভয় করতেন এবং অন্যদিকে মরহুম শহীদকে নির্দোষ বলে জানতেন। অতএব এই কারণেই তিনি মরহুমের কারাবাসকালীন সময়ে সর্বদা এই পরামর্শই দিচ্ছিলেন যে, আপনি এই কাদিয়ানী লোকটিকে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে মানবেন না এবং এই ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করবেন, তাহলে আপনাকে স-সম্মানে মুক্তি দেয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে যে দুর্গে থাকতেন সেই দুর্গেই শহীদ মরহুমকে বন্দী করেছিলেন, যাতে বারবার তাকে ডেকে আনার সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে আরো একটি কথা লেখা প্রয়োজন এবং প্রকৃতপক্ষে এই একটি কথাই বিপদের কারণ হয়েছে। কথাটি হলো শহীদ আব্দুর রহমানের সময় হতে এই বিষয়টি আমীর ও মৌলভীরা খুব ভালভাবে জানতেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবিকারক কাদিয়ানী জেহাদের ঘোর বিরোধী এবং নিজ পুস্তকাদিতে এই বিষয়ের উপর বার-বার জোর দিয়েছেন যে, এই যুগে তলোয়ারের জেহাদ জায়েয নয়। ঘটনাক্রমে এই আমীরের পিতা তলোয়ারের জেহাদ ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য কর্ম) হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্তক লিখেছিলেন, যা আমার দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকাদির সম্পূর্ণ বিরোধী। পাঞ্জাবের কোন-কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক, যারা নিজেদের একত্ববাদী ও আহলে হাদিস বলে বেড়াত, তারা আমীরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সম্ভবত তাদের মুখ থেকে বর্তমান আমীরের পিতা আমীর আব্দুর রহমান ঐ পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু শুনে থাকবেন এবং শহীদ আব্দুর রহমানের হত্যারও এটি কারণ হয়েছিল, আমীর আব্দুর রহমান ধারণা করেছিলেন, এই ব্যক্তি ঐ দলের মানুষ–যারা জেহাদকে হারাম বলে জানে। এটা নিশ্চিত, নিয়তির অমোঘ ও অবধারিত বিধানের আকর্ষণে মরহুম মৌলভী আব্দুল লতিফও এই ভুল করেছিলেন যে, বন্দী অবস্থায়ও তিনি প্রমাণ করেন, বর্তমান যুগ জেহাদের যুগ নয় এবং ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ, যিনি প্রকৃতপক্ষেই মসীহ। তার শিক্ষা হলো, বর্তমান যুগ যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার যুগ, তলোয়ারের সাহায্যে ধর্ম বিস্তার করা জায়েয নয়। বর্তমানে এই ধরনের বৃক্ষ ফল দান করবে না, বরং অতি শীঘ্র এটা শুকিয়ে যাবে। যেহেতু মরহুম শহীদ সত্য কথা বলতে কারও পরোয়া করতেন না এবং প্রকৃতপক্ষে সত্য প্রচার করার সময় তিনি নিজ মৃত্যুকেও ভয় করতেন না, সেহেতু এরূপ কথা তার মুখ হতে বের হল। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তার কোন-কোন মুরীদ বর্ণনা করেন, যখন তিনি মাতৃভূমির দিকে

রওয়ানা হন তখন তিনি বারবার বলছিলেন, কাবুলের মাটি নিজ সংশোধনের জন্য আমার রক্তের মুখাপেক্ষী। প্রকৃতপক্ষে তিনি সত্য কথা বলছিলেন। কেননা যদি কাবুল ভূখন্ডে এক কোটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হতো এবং শক্তিশালী যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে ঐগুলিতে আমার প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়া প্রমাণ করা হতো তবুও কখনও ঐ সকল বিজ্ঞাপনে এমন প্রভাব হতো না, যেরূপ প্রভাব এই শহীদের রক্তে হয়েছে। কাবুলের মাটিতে এই রক্ত ঐ ক্ষুদ্র বীজের মত পড়েছে যা সময়ের মধ্যে প্রকান্ড বৃক্ষে পরিণত হয় এবং হাজার-হাজার পাখি এতে নিজেদের জন্য বাসা বাঁধে। এখন আমি এই বেদনাদায়ক ঘটনার অবশিষ্টাংশ নিজ জামাতের জন্য লিখে এই প্রবন্ধটি শেষ করছি। চার মাস জেলখানায় অতিবাহিত করার পর আমীর শহীদ মরহুমকে নিজের কাছে ডাকেন এবং সাধারণ দরবারে তওবা করার জন্য তাকে আহ্বান জানান। তিনি অত্যন্ত শক্তভাবে তাকে বলেন, যদি তুমি এখনো কাদিয়ানীর সত্যায়নকে ও তার নীতিসমূহের সত্যায়নকে আমার সামনে অস্বীকার কর, তাহলে তোমাকে প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে এবং তোমাকে স-সম্মানে ছেড়ে দেয়া হবে। শহীদ মরহুম উত্তরে বলেন, সত্য হতে তওবা করাতো অসম্ভব। এই পৃথিবীর শাসকের শাস্তিতো মৃত্যু পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আমি তাঁকে ভয় করি যাঁর শাস্তি কখনো শেষ হয় না। হ্যাঁ, যেহেতু আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সেহেতু আমি চাই আমার ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী আলেমদের সাথে আমার বাহাসের ব্যবস্থা করা হোক। যদি আমি যুক্তি প্রমাণে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হই তাহলে আমাকে শাস্তি দেয়া হোক। বর্ণনাকারীরা বলেন, আমরা এই আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমীর এই প্রস্তাব পসন্দ করেন এবং শাহী মসজিদের খান মোল্লা খান আটজন মুফতিকে বাহাসের জন্য নির্বাচিত করা হল এবং লাহোরী ডাক্তার–যিনি নিজেই পাঞ্জাবী হওয়ার দরুন কঠোর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন –তাকে সালিশ হিসাবে নিয়োগ করে পাঠানো হল।

বিতর্কের সময় খুব জনসমাগম হয়েছিল। দর্শকরা বলেন, আমরা বিতর্কের সময় উপস্থিত ছিলাম। বিতর্ক লিখিত ছিল বিধায় উপস্থিত দর্শকরা কিছুই শুনছিল না। সুতরাং এই বিতর্ক সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। সকাল সাতটা হতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত বিতর্ক চলছিল। এরপর যখন আসরের নামাযের শেষ সময় উপস্থিত হল, তখন তাকে কুফরীর ফতওয়া দেয়া হল। বিতর্কের শেষ পর্যায়ে শহীদ মরহুমকে এ-ও জিজ্ঞাসা করা হল, যদি এই কাদিয়ানী ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত মসীহ

হন–তাহলে তুমি হযরত ইসা আলায়হিস সাল্লাম সম্বন্ধে কি বল? তিনি কি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, নাকি আসবেন না? তখন তিনি বড়ই দৃঢ় চিত্ততার সাথে উত্তর প্রদান করেন, হযরত ইসা আলায়হিস সালাম মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কখনো ফিরে আসবেন না। কুরআন করীম তার মারা যাওয়া এবং ফিরে না আসার সাক্ষী। যেসব মৌলভী হযরত ইসা (আ.) এর কথা শুনে নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিল তাদের মত সব লোক তখন গালাগালি করতে আরম্ভ করল এবং বলল, এখন এই ব্যক্তির কাফের হওয়ার মধ্যে কি কোন সন্দেহ আছে? এরপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় এই কুফরীর ফতওয়া লেখা হল এবং আখওয়ান্দযাদা হযরত শহীদ মরহুমকে ঐভাবেই পায়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কারাগারে প্রেরণ করা হল। এখানে একথা বর্ণনা করা বাকী আছে, যখন সাহেবযাদা মরহুমের সাথে ঐ সকল হতভাগ্য মৌলবীর বিতর্ক চলছিল তখন আট ব্যক্তি শহীদ মরহুমের মাথার উপর খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর এই কুফরীর ফতওয়া রাতে আমীর সাহেবের কাছে প্রেরণ করা হল। কিন্তু চালাকী করে এবং বুঝে–শুনে বিতর্কের কাগজ-পত্রাদি তার কাছে প্রেরণ করা হয়নি এবং এই বিতর্কের বিষয়বস্তু জনগণের কাছেও প্রকাশ করা হয়নি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা শহীদ মরহুম কর্তৃক উপস্থাপিত কোন দলিল প্রমাণই খন্ডন করতে পারেনি। কিন্তু আক্ষেপ আমীরের উপর! তিনি কুফরীর ফতওয়ার উপর আদেশ দিলেন কিন্তু বিতর্কের কাগজ–পত্রাদি চেয়ে পাঠাননি। অথচ তার উচিত ছিল, ঐ প্রকৃত বিচারকের ভয়ে–যার কাছে তিনি অতি শীঘ্র সকল ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্য ত্যাগ করে ফিরে যাবেন, তার স্বয়ং বিতর্কের সময় উপস্থিত থাকা উচিত ছিল; বিশেষত যতক্ষণ তিনি জানতেন এই বিতর্কের ফলে একজন নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রাণনাশ হবে। এমতাবস্থায় খোদাভীতির দাবি এটিই ছিল, তিনি নিজে যেকোনভাবে এই মজলিসে উপস্থিত থেকে কোন অপারাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই মযলুম শহীদের উপর এরূপ নিপীড়ন না চালাতেন; যে অন্যায়ভাবে তাকে এক দীর্ঘ সময় কারাগারে কষ্টে দেয়া হল; এরপর তার মাথার উপর খোলা তলোয়ার ধরে আটজন সিপাহীকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল এবং এভাবে এক বেদনাদায়ক শাস্তি ও চাপের মধ্যে রেখে তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে বাধা দেয়া হল। যদি তিনি এরূপ না করে থাকেন তাহলে কমপক্ষে ন্যায় বিচারের দাবি অনুযায়ী বিতর্কের কাগজ–পত্রাদি তার চেয়ে পাঠানো কর্তব্য ছিল। বরং পূর্বেই এই তাগিদ দিয়ে দেয়া উচিত ছিল, বিতর্কের কাগজ-পত্রাদি যেন আমার কাছে প্রেরণ করা হয়

বিতর্কের কাগজ–পত্রাদি তার কাছে প্রেরণ করার জন্য পূর্বেই তাঁর নির্দেশ প্রদান করা উচিত ছিল। এমনকি কাগজ–পত্রাদি তার নিজেই দেখা যথেষ্ট ছিল না বরং সরকারী পর্যায়ে এই সকল কাগজ ছাপিয়ে দেয়া উচিত ছিল যে, দেখ কিভাবে এই ব্যক্তি আমাদের মৌলভীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হার মেনেছে এবং কাদিয়ানীর প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার ব্যাপারে, জেহাদ নিষিদ্ধ হওয়া এবং হযরত মসীহ (আ.) এর মৃত্যুর ব্যাপারে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। হায়! এই নির্দোষ ব্যক্তিকে তার চোখের সামনে একটি ছাগলের ন্যায় জবাই করা হল। সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও এবং সম্পূর্ণরূপে দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করা সত্ত্বেও এবং এরূপ দৃঢ়চিত্ততা সত্ত্বেও–যা কেবলমাত্র আল্লাহর ওলীগণকে দেয়া হয়ে থাকে, তাকে পাথর নিক্ষেপ করে টুকরা-টুকরা করে দেয়া হল। তার স্ত্রী ও তার এতীম শিশুদের খোসত হতে গ্রেফতার করে অত্যন্ত লাঞ্ছনা এবং পীড়াদায়ক শস্তির মধ্যে সশস্ত্র প্রহরায় অন্যত্র প্রেরণ করা হল। হে নির্বোধ! মুসলমানদের ধর্মীয় মতভেদ এবং ভিন্নমত অবলম্বনের শাস্তি কি এই হয়ে থাকে? তুমি কি ভেবে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত করলে? এই আমীরের দৃষ্টিতে এবং তার মৌলভীদের ধারণা অনুযায়ী ইংরেজ রাজত্ব একটি কাফেরের রাজত্ব। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় দল-উপদল এই রাজত্বে বসবাস করছে। অদ্যাবধি কি ইংরেজ সরকার কোন মুসলমানকে বা কোন হিন্দুকে এই অপরাধের জন্য ফাঁসি দিয়েছে যে, তার ধর্মীয় মত পাদ্রীদের মত হতে ভিন্ন? হায় আফসোস! সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এবং হাজার-হাজার সম্মানিত লোকের সাক্ষ্য ভিত্তিক পাক-পবিত্রতায় ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও এক নিষ্পাপ ও নিরীহ ব্যক্তিকে ধর্মীয় মতানৈক্যের দরুণ এরূপ নির্দয়ভাবে হত্যা করা হল। আকাশের নীচে একটি বড় যুলুম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আমীরের চেয়ে ঐ গভর্ণর হাজার গুণে উত্তম ছিলেন, যিনি একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হযরত মসীহ (আ.)-কে গ্রেফতার করেছিলেন। অর্থাৎ, আমি পিলাতের কথা বলছি–যার বর্ণনা আজও বাইবেলে বিদ্যমান আছে। ইহুদী মৌলবীরা যখন হযরত মসীহের উপর কুফরীর ফতওয়া লিখে এই আবেদন করল, একে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হোক। তখন পিলাত বলেন, এই ব্যক্তির আমি কোন অপরাধ দেখি না। আফসোস! এই আমীরের অন্ততপক্ষে মৌলভীদের একথা তো জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, সঙ্গেসারের ফতওয়া কি ধরনের কুফরীর উপর দেয়া হল এবং এই মতভেদেকে কেন কুফরীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। কেন তাদের এই কথা জিজ্ঞাসা করা হল না, তোমাদের নিজেদের

ফেরকাসমূহের মধ্যেও অনেক মতভেদ আছে। এক ফেরকাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ফেরকার লোকদের কি সঙ্গেসার করা উচিত? যে আমীরের বিচার এরূপ, জানি না সে খোদার কাছে কি জবাব দিবে?!

এরপর কুফরীর ফতওয়া দিয়ে শহীদ মরহুমকে কারাগারে প্রেরণ করা হল। সোমবার ভোর বেলায় উক্ত শহীদকে সালাম খানায় অর্থাৎ আমীর সাহেবের গৃহে খাস দরবারে ডাকা হল। তখনও বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। আমীর সাহেব যখন দুর্গ হতে বের হলেন তখন শহীদ মরহুম রাস্তার এক জায়াগায় বসেছিলেন। আমীর সাহেব তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞাসা করেন, আখওয়ান্দযাদা সাহেব! কি সিদ্ধান্ত নিলেন? শহীদ মরহুম কিছু বললেন না। কেননা তিনি জানতেন, এরা যুলুম করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। কিন্তু সিপাহীদের মধ্য হতে একজন বলল, লাঞ্ছিত হয়েছে। অর্থাৎ, কুফরীর ফতওয়া লেগেছে। এরপর যখন আমীর সাহেব স্বীয় এজলাসে আগমন করেন। এজলাসে বসেই প্রথমে আখওয়ান্দযাদা সাহেব মরহুমকে ডেকে বলেন আপনার উপর কুফরীর ফতওয়া লেগেছে। এখন বলুন তওবা করবেন নকি শাস্তি ভোগ করবেন? তখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি সত্য হতে তওবা করতে পারি না। আমি কি প্রাণের ভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করে নিব? আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। তখন আমীর পুনরায় তওবা করার জন্য বলেন এবং তওবা করলে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু উক্ত শহীদ খুব দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমার কাছ থেকে এটা আশা করো না, আমি সত্য হতে তওবা করব। এই কাহিনীর বর্ণনাকারীগণ বলেন, এটি শোনা কথা নয় বরং আমরা স্বয়ং এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম এবং তা একটি বড় সামাবেশ ছিল। শহীদ মরহুম প্রত্যেকটি আবেদন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নাকচ করতে থাকেন এবং তিনি নিজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেন, নিশ্চয় আমি এই রাস্তায় পা দিব। তখন তিনি এ-ও বলেন, নিহত হওয়ার পর ছয় দিনের মধ্যে আমি আবার জীবিত হয়ে যাব। এই গ্রন্থের লেখক আমি বলছি, তিনি এই কথা হয়তো ওহীর ভিত্তিতে বলেছিলেন–যা ঐ সময়ে তার উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা ঐ সময়ে শহীদ মরহুর মুনকাতেইন এ প্রবেশ করেছিলেন এবং ফিরিশতাগণ তার সাথে করমর্দন করছিলেন। তখন ফিরিশতাদের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েই তিনি এভাবে কথা বলেন এবং একথার একই অর্থ ছিল: ওলীআল্লাহ ও আবদালদের

যে জীবন দেয়া হয়–আমি ছয় দিনের মধ্যে সেই জীবন পেয়ে যাব এবং যখন খোদার দিন আসবে–অর্থাৎ, সপ্তম দিনে আমি জীবিত হয়ে যাব। স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহর ওলীগণ এবং ঐ সকল বিশেষ মানুষ–যারা খোদাতায়ালার পথে শহীদ হন তাদের কয়েক দিন পরেই জীবিত করা হয় যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন, “ওয়ালা তাহসাবানাল্লাযিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতান বাল আহইয়াউন” (সুরা আলে ইমরান : ১৭০)। অর্থাৎ, যাদের আল্লাহর পথে হত্যা করা হয় তাদের  তোমরা মৃত বলো না। তারা তো জীবিত। সুতরাং শহীদ মরহুমের ইঙ্গিত এই মর্যাদার দিকেই ছিল। আমি এক দিব্য-দর্শনে দেখলাম, ‘সরো’ নামক বৃক্ষের একটি বড় লম্বা শাখা, যা অত্যন্ত সুন্দর ও সতেজ ছিল, তা আমাদের বাগান হতে কাটা হয়েছে এবং তা এক ব্যক্তির হাতে রয়েছে। তখন কোন একজন বলল, এই কর্তিত শাখাটি ঐ ভূমিতে, যা আমার গৃহের পার্শ্বে অবস্থিত–ঐ কুল বৃক্ষের কাছে লাগিয়ে দাও যা ইতোপূর্বে কর্তন করা হয়েছে, এটা আবার গজিয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ওহী হল, কাবুলে কাটা হয়েছে এবং সরাসরি আমাদের দিকে আসছে। এর আমি এই তাবির (স্বপ্নের ব্যাখ্যা–অনুবাদক) করেছি, শহীদ মরহুমের রক্ত বীজের ন্যায় মাটিতে পড়েছে এবং এটা অত্যন্ত ফলবান হয়ে আমার জামাতকে বৃদ্ধি করবে। এই দিকে আমি স্বপ্ন দেখলাম এবং অন্যদিকে শহীদ মরহুম বলেন, ছয় দিনের মধ্যে আমাকে জীবিত করা হবে। আমার স্বপ্ন এবং শহীদ মরহুমের এই উক্তির পরিণাম একই। শহীদ মরহুম মরে জামাতকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করলেন। প্রকৃতপক্ষে আমার জামাত একটি বড় দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী ছিল। আজও আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে, যারা সামান্য খেদমত করে মনে করবে, তারা মহৎ কাজ করেছে যেন তারা আমার উপর এহসান করেছে। অথচ এটা তাদের উপর খোদার এহসান, তিনি তাদের এই খেদমতের জন্য তৌফিক দান করেছেন। কেউ-কেউ এমন আছে যারা সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে ও সত্যতার সাথে এদিকে আসেনি এবং তার যে ইমানের শক্তি এবং চরম পর্যায়ের সত্যতা ও পবিত্রতার দাবি করে, শেষ পর্যন্ত তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারে না। জড় দুনিয়ার ভালবাসায় তারা ধর্মকে হারিয়ে ফেলে এবং সামান্য পরীক্ষাকেও তারা সইতে পারে না। খোদার জামাতে প্রবেশ করেও তাদের দুনিয়াদারী হ্রাস পায় না। কিন্তু খোদাতায়ালার হাজার শোকরগুযারী করছি, এরূপ লোকও আছে, যারা সরল অন্তঃকরণে ইমান এনেছে এবং সরল অন্তঃকরণে এই পথ গ্রহণ করেছে এবং এই পথে যেকোন কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু এই

বীর পুরুষ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, ঐ শক্তি আজও এই জামাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। খোদা সবাইকে ঐ ইমান এবং ঐ দৃঢ়চিত্ততা দান করুন, যার দৃষ্টান্ত এই শহীদ মরহুম পেশ করেছেন। এই পার্থিব জীবন–যার সাথে শয়তানী হামলার সংমিশ্রণ রয়েছে, তা কামেল মানুষ হতে বাধা প্রদান করে। এই জামাতে অনেক লোক প্রবেশ করবে। কিন্তু আফসোস, অতি অল্প লোকই এই দৃষ্টান্ত দেখাবে।

এরপর আমি প্রকৃত ঘটনার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করে লিখছি, যখন শহীদ মরহুম প্রত্যেকবার তওবা করার আবেদনে তওবা করতে অস্বীকার করেন তখন আমীর হতাশ হয়ে নিজ হাতে একটি লম্বা চওড়া কাগজ লেখেন এবং এতে মৌলভীদের ফতওয়া রেকর্ড করেন। এতে এই কথা লেখেন, সঙ্গেসার করে দেয়া এরূপ কাফেরের দন্ড। তখন এই ফতওয়া আখওয়ান্দযাদা মরহুমের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হল। এরপর আমীর শহীদ মরহুমের নাকে ছিদ্র করে এতে রশি ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ রশির সাহায্যে শহীদ মরহুমকে টেনে বধ্যভূমিতে–অর্থাৎ, সঙ্গেসার করার স্থানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তখন ঐ যালেম আমীরের আদেশে এরূপই করা হল। শহীদ মরহুমের নাকে ছিদ্র করে ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে তাতে রশি ঢুকিয়ে দেয়া হল। এরপর ঐ রশির সাহায্যে শহীদ মরহুমকে খুব হাসি-বিদ্রুপ-গালিগালাজ ও অভিসম্পাত দিতে-দিতে বধ্যভূমি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। আমীর নিজের সমস্ত দলবল, কাযী, মুফতী ও অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে এই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখতে-দেখতে বধ্যভূমি পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং শহরের হাজার-হাজার অগণিত মানুষ এই তামাশা দেখার জন্য গেল। বধ্যভূমিতে পৌঁছার পর শাহযাদা মরহুমকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দেয়া হল। এরপর কোমর পর্যন্ত মাটিতে পোঁতা অবস্থায় আমীর তার কাছে গিয়ে বলল, যদি তুমি কাদিয়ানীকে–যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি করে–তাকে অস্বীকার কর, তাহলে এখনো তোমাকে আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি। এখন তোমার শেষ সময় এবং তোমাকে শেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে। তুমি নিজের প্রাণ ও পরিবার-পরিজনের উপর অনুগ্রহ কর। তখন শহীদ মরহুম উত্তর প্রদান করেন, নাউযুবিল্লাহ! সত্যকে কিভাবে অস্বীকার করতে পারি? তিনি আরো বলেন, প্রাণেরই বা কি অর্থ আছে এবং স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততিই বাকি জিনিস!? যাদের জন্য আমি ইমান বিসর্জন দিব? আমার দ্বারা কখনো তা সম্ভব হবে না। আমি সত্যের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তখন কাযী ও ফেকাহবিদরা–এই ব্যক্তি

কাফের; এই ব্যক্তি কাফের; একে সত্বর সঙ্গেসার কর−বলে হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন। এই সময় আমীর এবং তার ভাই নসরুল্লাহ খান এবং কাযী আব্দুল আহমদ কামিদান পমুখ ঘোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং অন্যান্য সকল মানুষ পদচারী ছিল। যখন এরূপ নাজুক অবস্থায় শহীদ মরহুম বার-বার বলেন, আমি ইমানকে প্রাণের উপর শ্রেয় মনে করি না, তখন আমীর স্বীয় কাযীকে আদেশ প্রদান করেন, প্রথমে তুমি পাথর নিক্ষেপ কর। কেননা, তুমি কুফরীর ফতওয়া দিয়েছ। কাযী বললেন, আপনি যুগের বাদশাহ! কজেই আপনি পাথর নিক্ষেপ করুন। তখন আমীর উত্তরে বলেন, শরীয়তের বাদশাহ তুমিই এবং এটা তোমারই ফতওয়া। এতে আমার কোন অধিকার নেই। তখন কাযী ঘোড়া হতে অবতরণ করে এবং একটি পাথর নিক্ষেপ করে। এই পাথরে শহীদ মরহুম আহত হলেন এবং তার গর্দান ঝুঁকে পড়ল। এরপর হতভাগ্য আমীর নিজের হাতে পাথর নিক্ষেপ করেন এবং তার অনুসরণে হাজার−হাজর পাথর নিক্ষিপ্ত হল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে এই শহীদ মরহুমের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেনি। এত পাথর নিক্ষেপ করা হল যে, শহীদ মরহুমের মাথার উপর পাথরের স্তুপ জমে গেল। তখন ফিরে যাওয়ার সময় আমীর বলেন, এই ব্যক্তি বলত, সে ছয়দিন পর জীবিত হয়ে যাবে। অতএব ছয়দিন পাহারা বসাতে হবে। বর্ণনাকারী বলেছে এই যুলুম−অর্থাৎ, সঙ্গেসার ১৪ই জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। এই বর্ণনার বেশিরভাগ তাদের−যার নিজেরাও পাথর মেরেছিল, যারা এই জামতের বিরোধী ছিল এবং যারা মারার কথা স্বীকার করেছে। বর্ণনাকরীদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তিও ছিলেন, যারা শহীদ মরহুমের শীষ্য ছিলেন। বর্ণনা শুনে মনে হয়, এই ঘটনা বর্ণনার চেয়েও অধিক বেদনাদায়ক। কেননা কেউ আমীরের যুলুমকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেনি। আমি যা কিছু লিখেছি তা অনেক চিঠি-পত্রের অভিন্ন অর্থ হতে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখেছি। সব কাহিনীতে সাধারনত অতিরঞ্জন থাকে। কিন্তু এই কাহিনীতে লোকেরা আমীরের ভয়ে তাদের যুলুম সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করেনি এবং অনেক রাখঢাক করে বর্ণনা করেছে। শাহযাদা আব্দুল লতিফের জন্য যে শাহাদাত নির্ধারিত ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। এখন যালেমের শাস্তি বাকি রয়েছে। ইন্নাহু মানইয়াতি রাব্বাহু মুজরিমানফাইন্না লাহু জাহান্নামা লা ইয়ামুতুফিহা ওলা ইয়াহ ইয়া (প্রকৃত বিষয় হলো, যে তার প্রভুর সমীপে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে নিশ্চয় তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে, যেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না (সুরা তাহা : ৭৫-অনুবাদক)। আফসোস! এই আমীর “মান ইয়াকতুলু মুমিনিন

মুতা'আম্মিদান (সুরা নিসা : ৯৪) অনুযায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করেছে (যে ব্যক্তি জেনেশুনে মুমিনকে হত্যা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে–আয়াত অনুযায়ী এই আমীর জাহান্নামে প্রবেশ করবে-অনুবাদক)। এই আমীর একবিন্দুও খোদাতায়ালাকে ভয় করেনি। অন্যদিকে মুমিনও এরূপ মুমিন, যদি সমস্ত কাবুলে তার দৃষ্টান্ত খোঁজা হয় তবুও তা পাওয়া যাবে না। এরূপ ব্যক্তিরা হলেন অমূল্য রত্ন, যারা সরল অন্তকরণে ইমান ও সত্যের জন্য জীবন বিসর্জন করেন এবং স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির জন্য কোন ভ্রুক্ষেপই করেন না।

**হে আব্দুল লতিফ! তোমার উপর হাজার-হাজার রহমত । তুমি আমার জীবদ্দশায়-ই স্বীয় সত্যবাদিতার নিদর্শন দেখিয়েছ।**

আমার মৃত্যুর পর আমার জামাতে যারা থাকবে আমি জানি না তারা কি করবে।

# ফারসি কবিতার বঙ্গানুবাদ

খোদার বীর সেই নওজোয়ান
পরমগুণ প্রকাশে মহীয়ান।

নিজেরে লুটালো সে
পাইতে খোদার ধাম,
অস্থায়ী নিবাস ত্যাজিল
দিয়া প্রাণের দাম।

জীবনের মোহে অনেক
ভয়–ভীতি বিরাজে,
অগণিত অজগরে
বিষ ফুটাতে আসে।

ধরা হতে আকাশ পানে
আগুনের কুন্ডলী,
রক্ত পিপাসু, জল প্লাবনের
সহস্র মন্ডলী।

দীর্ঘ পথ বন্ধুর বাড়ি
কন্টক ঝোপ–ঝাড়,
সহস্র বিপদ আছে
জেনো সে সমাচার।

দেখ এই অনারবের
অদম্য সাহস,
মুহুর্তে পার হলেন তিনি
পৃথিবীর বিকষ।

খোদার এমন সৎ সাহসী
বান্দা-ই এমন করে ,
আদেশ পেলে খোদার দ্বারে
দাঁড়ায় নত শিরে।

বিষ ভক্ষণ করেন এই
সাহসী প্রেমিক,
অমৃত লাভ হলো তার
মরিয়া অধিক।

মরণের পেয়ালা যদি
কেউ পান নাহি করে,
ঐ অধম কিভাবে বল
জীবন লাভ করে?

এই মরণে আছে জেনো
জীবনের কুন্তলা,
জীবন চাইলে তুলে লও
সে মরণের পেয়ালা।

কামনা–বাসনার দাসে
বন্দি যদি থাক,
মুক্তির সাধ জান্মাইতে
তুচ্ছ সাধ ঢাক।

দুনিয়ার আসক্তি যদি
তোমার সাথে চলে,
জেনো তুমি পাপের তরেই
মান–সম্মান হারালে।

শয়তান সেনা চায় যে তোমায়
শুকনো ঘাসের মত,
ফেলিতে নরক-আগুনে
চলে অবিরত।

আশার লোভে ভয়ে ক্ষোভে
সর্বদা ইমানের,
ইস্তেকামত নষ্ট হয় যে
জানিও মুমিনের।

আফসোস শত দুনিয়ার
মিথ্যা মায়ার জালে,
ধর্ম মর্যাদার কেন
হানি গো করিলে?

খোদার দ্বীনের প্রেমিক যারা
খোদার প্রেমে মাতে,
কলুষ আত্মা! ধর্ম সেবার
কি উদাহরণ আছে?

দুরাত্মা! নরাধম
আপন ভবে থাক !
কথার মালা গেঁথ না আর
সীমার ভিতর থাক।

নিজেরে ভাবিছ সাধু
রে পাপাসক্ত নর!
ভুল বুঝলেঃ হেদায়াত কী?
খোদা– অধীশ্বর।

সুখের কথায় দয়াল খোদার
রেযা যে পাবে না,
তার লাগি না মরলে চির
সুখের জীবন মানা।

অহংকার-বৈরিতা ছাড়
চাও খোদাতায়ালার দয়া,
বদমেজাযী দুর্ভাগা!–যেন পাও
খোদার নুরের ছায়া।

উড়ছ যতই উচ্চে
মনে রাখ আজি,
হতে পারে বিশ্ব স্রষ্টার, তুমি
অন্তরে অবিশ্বাসী।

দুনিয়ার ঘরকে তুমি
ভাব চিরস্থায়ী,
মজিলে এ সরাইখানায়
হলে তার পিয়াসী।

ডাক আসলে যেতে যখন
হবে রে ঘর ছেড়ে,
বুদ্ধিমান বান্দা কেন
ডুবেছ বন্দরে।

দুভার্গ্য দুর্দশার
কারণ জান তুমি,
লোভের বশে খোদা ভুলে
রইবে কেন তুমি।

আল্লাহর করুণার চাহনি
পড়ে যার মনে,
দুনিয়াকে ছাড়ে সে জন
ভোলে তা তক্ষণে।

তপ্ত মরুর জনহীন
গহীন বনে সে,
ভালবাসে থাকতে একা
কাঁদে খোদা প্রেমের নেশে।

খোদার সে-ই তো বান্দা হয়
সত্যকে যে দেখে,
মরার আগেই মরতে সে চায়
ভঙ্গুর ভুবন ত্যাজে।

খোদা ছাড়া কেউই নাই
সাবধান হয়ে থেকো,
নশ্বর ভুবন ত্যাজিবার
সেই ছবিটি আঁকো।

কেমনে বুঝিব আমি
বুদ্ধি তোমার আছে,
যদি বিষ পান কর
জীবন নাশিবারে।

আব্দুল লতিফ! পুণ্য পুরুষ
দেখো তারে ওরে!
বিলিয়ে দিলেন জীবন খানি
খোদার আশীষ ভরে।

নিজের প্রাণ খোদার তরে
দান করেছেন তিনি,
পাথর তলেই আজো সে প্রাণ
গায় বিশ্বাসের কাহিনী!

খোদার পুরুষ যারা হয়
এমনই যে করে,
সত্যের সেবক দিগ্বিজয়ী
আদর্শের আকারে।

নিজেরে সে দান করেছে
খোদার লাগি ফানা,
সে বিধানে শহীদ তিনি
ত্যাগী তা-ও জানা।

মাটিতে মাথার টুপি
প্রাণ সীমানার বাহিরে,
বিবস্ত্র বেনাম হয়ে
শাহী পদও ছাড়ে।

নিজেরে নিজে ভুলিল
খোদায় একাকার,
মান-সম্মান ভুলল পাইতে
প্রভুর আলো সমাহার।

তাঁরে স্মরিলে আমার
খোদা মনে আসে,
খোদার রাহে কবুল তিনি
বিশ্বস্ততার দাসে।

ইমানের পথ যাচে যেজন
এমনি পায় জেনো,
সাধনার পথ খুলে যে যায়
সহজে অমিয়।

দুনিয়ার মোহে তুমি
বন্দি হয়ে রও,
বাঁধন ছিঁড়ে না মরলে
মুক্ত কেমনে হও?

দুনিয়া পূজারী কুকুর সম!
না যদি গো মর,
পূত-বন্ধুর আচল; নাপাক!
কি করে গো ধর ?

জীবন লাগি মর তুমি
নিজেরে নাশ কর,
আল্লাহর দয়া হৃদয় মাঝে
ঝরে যেন নির্ঝর।

ঈর্ষা–বিদ্বেষ, অহংকারে
জীবন কাটালে তাতে,
মুখ ফেরালে সত্যতা আর
দৃঢ়–বিশ্বাস হতে।

পুণ্যাত্মা–পুণ্যাত্মায় হয়
হৃদয়ের মিল ভাই,
মন্দলোকে থু-থু ফেলে
মণি মুক্তায় হায়!

মরণের বীজ বপন করা
সত্যিকারের দ্বীন,
দুনিয়ারে ভুলে যে যাও
নিত্য – প্রতিদিন।

ব্যাথায় কাতর হয়ে কেউ
চিৎকার যদি করে,
কেউ-না-কেউ দাঁড়ায় সেথায়
উদ্ধারিতে তারে।

অসাবধান লোকের লাগি
সাবধানী ব্যাকুল হয়,
তেমন অন্ধের প্রতি চক্ষুস্মনের
বড়ই মায়া হয়।

খোদার নিয়ম এমন করেই
কার্যকরী হয়,
সবল যিনি–দুর্বলেরে
জানায় তা নিশ্চয়।

*ইলাহামী ছন্দঃ*

**আনন্দিত হও পরিণাম উত্তম হবে।**

# আমার জামাতের জন্য কিছু উপদেশ

হে আমার জামাত! খোদাতায়ালা আপনাদের সাথে থাকুন। ঐ কাদের-করিম খোদা আপনাদের পরকালের সফরের জন্য এমনভাবে প্রস্তুত করুন, যেভাবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের প্রস্তুত করা হয়েছিল। ভালভাবে মনে রেখো! দুনিয়া এক অসার বস্তু। অভিশপ্ত ঐ জীবন, যা কেবল দুনিয়ার জন্য এবং হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য। এরূপ মানুষ যদি আমার জামাতে থাকে, তবে সে বৃথাই আমার জামাতে প্রবেশ করেছে। কেননা, সে ঐ শুষ্ক শাখায় ন্যায়, যা ফল দিবে না।

হে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরা! তোমরা দৃঢ়তার সাথে এই শিক্ষায় প্রবেশ কর, যা তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাকে প্রদান করা হয়েছে। তোমরা খোদাকে এক অদ্বিতীয় জেন এবং তার সাথে আকাশে ও পৃথিবীতে কোন বস্তুকে শরিক করো না। খোদা উপকরণ ব্যবহার করতে তোমাদের নিষেধ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করতে উপকরণের উপরই ভরসা করে–সে মুশরিক। আদিকাল হতে খোদা বলে আসছেন, হৃদয় পবিত্র না হওয়া ব্যতীত পরিত্রাণ নেই। সুতরাং তোমরা পবিত্রচিত্ত হয়ে যাও এবং হীন হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ হতে দূরে যাক। মানুষের নফসে আম্মারায় (অবাধ্য আত্মায়-অনুবাদক) কয়েক ধরনের কলুষ নিহিত থাকে। কিন্তু সবচেয়ে অধিক কলুষ হল অহংকার। অহংকার না থাকলে কোন ব্যক্তি কাফের থাকত না।

সুতরাং তোমরা প্রকৃত বিনয়ী হয়ে যাও। সাধারণভাবে মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। যে স্থলে তোমরা তাদের বেহেশত প্রাপ্তির জন্য বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়ে থাক, সে স্থলে তোমাদের এই বক্তৃতা কিভাবে সঠিক হতে পারে–যদি তোমরা এই কয়েক দিনের দুনিয়াতে তাদের অমঙ্গল কামনা কর। খোদাতায়ালার প্রতি কর্তব্যসমূহ আন্তরিক ভীতির সাথে সম্পাদন কর। কেননা, তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। নামাযে খুব দোয়া কর, যাতে তোমাদের খোদা নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তোমাদের হৃদয়কে পবিত্র করেন। কেননা,

মানুষ দুর্বল। প্রত্যেকটি মন্দ স্বভাব, যা দূর হয়, তা খোদার শক্তিতেই দূর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদার কাছ থেকে শক্তি লাভ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মন্দ স্বভাব দূর করতে সমর্থ হবে না। ইসলাম কেবলমাত্র এটা নয় যে, প্রথা অনুযায়ী নিজেকে কলেমা বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করবে; বরং ইসলামের যথার্থতা হলো, তোমাদের আত্মা খোদাতায়ালার দরবারে অবনত হয়ে যাবে এবং খোদা ও তাঁর আদেশগুলো প্রত্যেক দিক হতে তোমাদের পার্থিব জীবনের উপর প্রাধান্য দিবে।

হে আমার প্রিয় জামাত! নিশ্চিতভাবে জেনো, যুগ নিজের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে এবং একটি সুস্পষ্ট বিপ্লব অভিব্যক্ত হয়েছে। অতএব তোমাদের আত্মাকে প্রতারিত করো না এবং অতি শীঘ্র সত্যবাদিতায় কামেল হয়ে যাও। কুরআন করিমকে নিজেদের নেতা হিসাবে আঁকড়ে ধর এবং সর্ববিষয়ে এ হতে আলো গ্রহণ কর। হাদিসকে আবর্জনার ন্যায় নিক্ষেপ করো না; কেননা এটা বড়ই প্রয়োজনীয়, এবং অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে এর ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু যখন কুরআনের বিবরণ হতে হাদিসের কোন বিবরণ বিরোধপূর্ণ হয় তখন এরূপ হাদিস ত্যাগ করবে, যাতে গোমরাহিতে না পড়। খোদাতায়ালা কুরআন শরিফকে অত্যন্ত হেফাযতের সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এই পবিত্র কালামের সম্মান কর। এর উপর কোন বস্তুকে প্রাধান্য দিও না। কেননা সকল সত্যতা ও বিশ্বস্ততা এর উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির কথা মানুষের হৃদয়কে ঐ পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে, যে পরিমাণে ঐ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান ও তাকওয়ার উপর তাদের আস্থা থাকে।

এখন দেখ! খোদা স্বীয় হুজ্জত (দলিল–প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছুর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা-অনুবাদক) তোমাদের উপর এভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, আমার দাবির অনুকূলে হাজার-হাজার দলিল-প্রমাণ সৃষ্টি করে তোমাদের এই সুযোগ দেয়া হয়েছে–যাতে তোমরা চিন্তা কর, যে ব্যক্তি তোমাদের এই জামাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তিনি কোন পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং কি পরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। তোমরা আমার পূর্বের জীবনের উপর কোন দোষারোপ করতে বা মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না, যাতে তোমরা এ ধারণা করতে পার, যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই মিথ্যা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত, এটিও সে মিথ্যা বলেছে। **তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আমার জীবনে**

**দোষারোপ করতে পার?** সুতরাং এটি খোদার অনুগ্রহ, তিনি প্রথম থেকেই আমাকে তাকওয়ার (খোদাভীতির) উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যারা চিন্তা করে, তাদের জন্য এটা একটি দলিল।

এছাড়া আমার খোদা শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে সত্যবাদীরূপে মানার জন্য যে পরিমাণ দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল তার সবটাই তোমাদের জন্য যোগান দিয়েছেন। আমার জন্য আকাশ হতে আরম্ভ করে পৃথিবী পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং সকল নবী আদি হতে আদ্যাবধি আমার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এই বিষয়টি যদি মানুষের হতো তাহলে এতে এই বিপুল পরিমাণ দলিল-প্রমাণ কখনো একত্রিত হত না। উপরন্তু খোদাতায়ালার সকল কিতাব এই কথার সাক্ষী, যে খোদার নামে মিথ্যা বলে, খোদা তাকে শীঘ্র পাকড়াও করেন এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনার সাথে তাকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তোমরা দেখছ, আল্লাহর পক্ষ হতে আমার প্রেরিত হওয়ার দাবি ত্রিশ বছরের অধিক হয়েছে। যেমন বারাহীনে আমহদীয়ার প্রথম অংশের প্রতি লক্ষ্য করলে তোমরা বুঝতে পারবে। সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, খোদা কি কখনো এই রীতি গ্রহণ করেছেন এবং যখন হতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতে তিনি কি কখনো এরূপ কাজ করেছেন, যে ব্যক্তি এরূপ মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ধূর্ত, অশিষ্ট এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে এবং ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রে খোদাতায়ালার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের মনগড়া এক নতুন ইলহাম বানিয়ে লোকদের বলে যে, খোদাতায়ালার পক্ষ হতে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে; এবং খোদাতায়ালা এরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাকে সাহায্য করেন? তার দাবি সপ্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগিয়ে দেন? অনুরূপভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের কিতাবসমূহে কুরআন শরিফে হাদিসসমূহে এবং স্বয়ং তার কিতাব বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল তা পূর্ণ করে জগদ্বাসীকে দেখান? এবং সত্যবাদীর ন্যায় ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে তাকে প্রেরণ করেন? এবং ঠিকই ক্রুশের প্রাধান্যের সময় যাকে খন্ডন করার জন্য ক্রুশ ধ্বংসকারী প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন অবধারিত ছিল, তাকে এই দাবির সাথে দাঁড় করিয়ে দেন? এবং তার সমর্থনে দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন দেখান? এবং পৃথিবীতে তাকে সম্মান প্রদান করেন? এবং পৃথিবীতে তার কবুলিয়ত বিস্তার করেন? এবং শত-শত ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষে পূর্ণ করেন?

এবং প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের জন্য নবীগণ কর্তৃক নির্ধারিত দিনে তাকে সৃষ্টি করেন? এবং তার দোয়া কবুল করেন? এবং তার বর্ণনায় প্রভাব সৃষ্টি করেন? একইভাবে তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন? অথচ তিনি জানেন, সে একজন মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়ভাবে জেনে-বুঝে তার প্রতি মিথ্যা ওহী আরোপ করে? তোমরা কি বলতে পার আমার পূর্বে খোদাতায়ালা অন্য কোন মুফতারির (যে ব্যক্তি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রতি এরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছিলেন?

অতএব হে খোদার বান্দারা! গাফেল হয়ো না। শয়তান তোমাদের যেন কুপ্ররোচণা না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেন, ঐ ওয়াদা পূর্ণ হল–যা আদি হতে খোদার পবিত্র নবীগণ করে আসছেন। আজ খোদার প্রেরিত পুরুষগণ ও শয়তানের মধ্যে শেষ যুদ্ধ। এটি ঐ-সময় ও ঐ-যুগ–যার প্রতি দানিয়াল নবীও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি সত্যবাদীদের জন্য একটি আশিসরূপে এসেছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে হাসি–ঠাট্টা করা হয়েছে। আমাকে কাফের ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এরূপ হওয়াই জরুরী ছিল–যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, যা গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম আয়াতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কেননা খোদা 'মুনইম আলাইহিম' এর ওয়াদা করে এই আয়াতে বলেছেন' এই উম্মতের মধ্যে ঐসব ইহুদীও সৃষ্টি হবে, যারা ইহুদী আলেমদের সদৃশ হবে। তারা হযরত ইসা (আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা ইসা (আ.)-কে কাফের, দাজ্জাল ও নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল। এখন চিন্তা কর, এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্য হতে আগমন করবে। এজন্য তার যুগে ইহুদী স্বভাববিশিষ্ট মানুষও সৃষ্টি হয়ে যাবে–যারা নিজেদের আলেম বলবে। অতএব আজ তোমাদের দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। যদি এই আলেম না থাকত, তাহলে এই পর্যন্ত এই দেশের সব মুসলমান অধিবাসী আমাকে গ্রহণ করত। সুতরাং সকল অস্বীকারকারীর পাপ এদের ঘাড়ে চাপবে। এরা ন্যায়পরায়ণতার প্রাসাদে না নিজেরা প্রবেশ করছে, না স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের প্রবেশ করতে দিয়েছে। এরা কতই-না ষড়যন্ত্র করছে! এদের গৃহে সংগোপনে কতই-না পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এরা কি খোদার উপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে? এরা কি সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় বাধ সাধতে পারবে–যার সম্বন্ধে নবী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এরা এই দেশের খল প্রকৃতির আমীরদের এবং হতভাগ্য

ঐশ্বর্যশালী বস্তুবাদী লোকদের উপর ভরসা করছে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে এরা কি? খোদার দৃষ্টিতে এরা মৃত কীট মাত্র।

হে মানব মন্ডলী! শুনে রাখ! এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী–যিনি পথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এই জামাতকে সকল দেশে বিস্তৃত করে দিবেন এবং হুজ্জত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল দ্বারা সকলের উপর তাদের বিজয় দান করবেন। **ঐদিন আসছে বরং ঐ দিন কাছে যখন পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই একটি ধর্ম হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদা এই ধর্মকে এবং এই জামাতকে উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ আশিসে বিভূষিত করবেন এবং যে কেউ একে শেষ করে দেয়ার চিন্তা করবে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া হবে। এই বিজয় চিরকাল কায়েম থাকবে। এমনকি এর কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।** যদি আমার সাথে ঠাট্টা–বিদ্রুপ করা হয় তাহলে এই ঠাট্টা–বিদ্রুপে আমার কি ক্ষতি হবে? কেননা এমন কোন নবী নাই যার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়নি। অতএব, এটা জরুরী ছিল, প্রতিশ্রুত মসীহের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হবে। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন:

يا حسرة على العباد مايأتيهم من رسول الا كانو به يستهزءون

(অর্থাৎ, আক্ষেপ আমার বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে এমন কোন রাসুল আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেনি (৩৬:৩১)-অনুবাদক)। সুতরাং খোদার পক্ষ থেকে এটা একটি নিদর্শন, প্রত্যেক নবীর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এমন ব্যক্তি–যিনি সব মানুষের সামনে আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন এবং তার সাথে ফিরিশতাগণও থাকবেন, তাঁর সাথে কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে? সুতরাং এই যুক্তি দ্বারাও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বুঝতে পারবেন, প্রতিশ্রুত মসীহের আকাশ হতে অবতরণ একটি মিথ্যা ধারণা মাত্র। **স্মরণ রেখো, কেউ আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মরবে, কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেউ মরিয়মের পুত্র ইসাকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। এরপর তাদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তাদের মধ্য হতেও কেউ মরিয়মের পুত্র ইসাকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। এরপর সন্তানদের সন্তানেরা মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশের প্রাধান্যের যুগও অতিবাহিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে; কিন্তু মরিয়মের পুত্র ইসা (আ.) এখনও আকাশ**

**হতে অবতীর্ণ হলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে। এরপর আজ হতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না, যখন ইসা (আ.) এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খৃস্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।**

এই ধারণা করো না, আর্য–অর্থাৎ, হিন্দু দয়নন্দী ধর্মের অনুসারীরা কোন কাজের বস্তু। তারা ঐ ভীমরুলের ন্যায়, যার মধ্যে হুল ফুটানো ছাড়া আর কিছুই নাই। তারা জানে না তওহীদ কী বস্তু। তারা আধ্যাত্মিকতা হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। দোষ ধরা এবং খোদার পবিত্র নবীদের গালমন্দ দেয়া তাদের কাজ। তাদের বড় কীর্তি হলো, তারা শয়তানী কুপ্ররোচণার আপত্তির এক ভান্ডার জমা করছে এবং খোদাভীতি ও পবিত্রতার রুহ তাদের মধ্যে নেই। স্মরণ রেখো! আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত কোন ধর্ম চলতে পারে না এবং আধ্যাত্মিকতাবিহীন ধর্ম কোন বস্তুই নয়। যে ধর্মে আধ্যাত্মিকতা নেই, যে ধর্মে খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্পর্ক নেই এবং সত্যতা ও বিশ্বস্ততার রুহ নেই, যে ধর্মের সাথে ঐশী-আকর্ষণ নেই এবং যে ধর্মের কাছে অসাধারণ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত নেই, সেই ধর্ম মৃত। তাকে ভয় করো না। তোমাদের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ জীবিত থাকবে, যারা এই ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখবে। কেননা, আর্যদের এই ধর্ম আকাশ হতে নয়, পৃথিবী হতে সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি আকাশের কথা পেশ না করে পৃথিবীর কথা উপস্থাপন করে। সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও এবং আনন্দে উচ্ছসিত হও, খোদা তোমাদের সাথে আছেন। যদি তোমরা সত্যতা ও ইমানের উপর কায়েম থাক তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের শিক্ষা প্রদান করবেন, ঐশী প্রশান্তি তোমাদের উপর অবতীর্ণ হবে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তোমরা সাহায্য লাভ করবে, প্রতি পদক্ষেপে খোদা তোমাদের সাথে থাকবেন এবং কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। ধৈর্যের সাথে খোদার আশিসের অপেক্ষা কর। গালি শুন এবং নিরব থাক। মার খাও এবং ধৈর্য ধর। যতদূর সম্ভব মন্দের মোকাবেলা হতে বিরত থাক, যাতে আকাশে তোমাদের কবুলিয়ত (গ্রহণযোগ্যতা–চলতিকারক) লিখিত হয়। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, যারা খোদাকে ভয় করে এবং যাদের হৃদয় খোদার

ভয়ে বিগলিত হয়ে যায়, খোদা তাদের সাথেই থাকেন এবং তিনি তাদের শত্রুদের শত্রু হয়ে যান। পৃথিবী সত্যবাদীকে দেখতে পায় না। কিন্তু সর্বজ্ঞানী ও সর্বদর্শী খোদা সত্যবাদীদের দেখে থাকেন। তিনি নিজ হাতে তাদের রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি সরল অন্তঃকরণে তোমাদের ভালবাসে এবং সত্য-সত্যই তোমাদের জন্য মরার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায় এবং তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের আজ্ঞানুবর্তিতা করে এবং তোমাদের জন্য সব পরিত্যাগ করে, তোমরা কি তাকে ভালবাস না এবং তোমরা কি তাকে সবচেয়ে প্রিয় মনে কর না? সুতরাং তোমরা যেখানে মানুষ হয়ে ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাস সেখানে খোদা কেন ভালবাসবেন না?

খোদা ভালভাবে অবগত আছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু কে এবং কে বিশ্বাসঘাতক এবং দুনিয়াকে কে প্রাধান্য দেয়। অতএব তোমরা যদি এভাবে বিশ্বস্ত হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের ও অন্যান্যের মধ্যে খোদার হাত (শক্তি-চলতিকারক) একটি পার্থক্য কায়েম করে দেখাবেন।

## বারাহীনে আহমদীয়ায় ৫১০ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা, অর্থাৎ ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর–যা সাহেবযাদা মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ সাহেব মরহুম এবং মিয়া আব্দুর রহমানের শাহাদাত সম্পর্কে করা হয়েছে এবং ঐ ভবিষ্যদ্বাণী–যা আমার হেফাযতকরণের ব্যাপারে করা হয়েছে

প্রকাশ থাকে, বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১০ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় যে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে তার অনুবাদ নিম্নরূপ :

‘যদিও লোকেরা তোমাকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা না করে কিন্তু খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন। খোদা তোমাকে নিশ্চয় নিহত হওয়া হতে রক্ষা করবেন। খোদা তোমাকে নিশ্চয় নিহত হওয়া হতে রক্ষা করবেন, যদিও লোকেরা রক্ষা না করুক।’

এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল, লোকেরা নিজেরাই হোক বা সরকারকে প্রতারিত করেই হোক, তোমাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করবে। কিন্তু খোদা তাদের তদবীরগুলো ব্যর্থ করে দিবেন। এই ইলাহী অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য হলো, যদিও নিহত হওয়া মুমিনের জন্য শাহাদাত, কিন্তু আল্লাহর বিধান, তাঁর দুই ধরনের প্রেরিত পুরুষ নিহত হন না। (১) প্রথমত: ঐ নবী–যিনি সিলসিলার সূচনাতে আগমন করেন, যেমন মুসায়ী সিলসিলায় হযরত মুসা আলায়হিস সাল্লাম এবং মুহাম্মদীয়া সিলসিলায় আমাদের প্রভু ও মওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। (২) দ্বিতীয়ত: ঐ সকল নবী ও আল্লাহর প্রেরিতগণ যারা সিলসিলার শেষে আগমন করেন-যেমন, মুসায়ী সিলসিলায় হযরত ইসা আলায়হিস সাল্লাম এবং মুহাম্মদী সিলসিলায় এই অধম। এই গোপন রহস্য, যেমন আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে কুরআন শরিফে يعصمك الله (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে বাঁচাবেন–অনুবাদক)

এর সুসংবাদ রয়েছে। একইভাবে এই খোদার ওহীতে আমার সম্পর্কে–

يَعْصِمُكَ اللّٰهُ

এর সুসংবাদ রয়েছে। এই ইলাহী প্রজ্ঞার তাগিদে সিলসিলার প্রথম ও শেষ প্রেরিত পুরুষকে কতল হতে এজন্য রক্ষা করা হয়, যদি সিলসিলার প্রথম প্রেরিত পুরুষ যিনি সিলসিলার প্রধান–তাকে শহীদ করা হয় তাহলে এই প্রেরিত পুরুষ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে অনেক সংশয় সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা, এখনও তিনি এই সিলসিলার প্রথম ইট। সুতরাং সিলসিলার ভিত্তি স্থাপিত হতে না হতে যদি এই সিলসিলার উপর এই আঘাত আসে, সিলসিলার যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনিই নিহত হয়ে যান তাহলে এই পরীক্ষা জনগণের ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে এবং নিশ্চয় তারা সন্দেহে নিপতিত হবে এবং এরূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাকে নাউযুবিল্লাহ, মুফতারি (যে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রমাণিত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি হযরত মুসা (আ.) ফেরাউনের সামনে গিয়ে ঐদিনই নিহত হয়ে যেতেন বা আমাদের নবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য যেদিন মক্কায় তার ঘর ঘেরাও করা হয়েছিল, যদি ঐ দিনই কাফেরদের হাতে শহীদ হয়ে যেতেন, তাহলে শরীয়ত ও সিলসিলার সেখানেই সমাপ্তি ঘটত। এরপর কেউ এর নামও নিত না। সুতরাং এই হেকমত ছিল যে, হাজার-হাজার ঘোরতর শত্রু থাকা সত্ত্বেও হযরত মুসা (আ.)-ও শহীদ হননি এবং আমাদের নবী (সা.)-ও শহীদ হননি। অপরদিকে যদি সিলসিলার শেষ প্রেরিত পুরুষকে শহীদ করা হয় তাহলে জনগণের দৃষ্টিতে সিলসিলার সমাপ্তির উপর অকৃতকার্যতা ও ব্যার্থতার দাগ লেগে যাবে। কিন্তু খোদাতায়ালার ইচ্ছা হলো, বিজয় ও কৃতকার্যতার সাথে সিলসিলার সমাপ্তি হবে। কেননা, ফয়সালা শেষ সংঘটিত ঘটনাসমূহের উপর হয়ে থাকে এবং সিলসিলার সমাপ্তির সময় অভিশপ্ত শত্রু কোন প্রকার আনন্দ লাভ করবে–এটা কখনো খোদাতায়ালার ইচ্ছা নয়; যেমন তার ইচ্ছা নয় সিলসিলার সূচনাতেই প্রথম ইট ভেঙে যাবে এবং অভিশপ্ত শত্রু আনন্দে উৎসব করবে। সুতরাং এজন্য ইলাহী প্রজ্ঞা মুসায়ী সিলসিলার শেষ হযরত ইসা আলায়হিস সালামকে ক্রুশীয় মৃত্যু হতে রক্ষা করেন। মুহাম্মদীয়া সিলসিলার শেষেও এই লক্ষ্যে চেষ্টা করা হয়েছিল। অর্থাৎ, মুহাম্মদী মসীহকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যার দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু খোদার ফযল প্রথম মসীহের তুলনায় এই মসীহের উপর অধিকতর উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত হয়েছে এবং মৃত্যুদন্ড হতে এবং যেকোন শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করেন। মোট কথা যেহেতু প্রথম ও শেষ সিলসিলার দু'টি প্রাচীর ও দু'টি পিলার রয়েছে সেহেতু আল্লাহর বিধান

প্রথম সিলসিলা ও শেষ সিলাসিলার প্রেরিত পুরুষকে হত্যা হতে রক্ষা করেন। যদিও দুষ্ট এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকেরা তাদের হত্যা করার চেষ্টা করেন কিন্তু খোদার হাত তাদের সাথে থাকে। কোন-কোন সময় নির্বোধ শত্রু ধোঁকায় নিপতিত হয়ে এই ধারণা করে, আমি কি ধার্মিক নই ও আমি কি নামায রোযায় মনোযোগী নই? ইহুদী ফেকাহবিদ ও আলেমদের ঠিক এই ধারণা ছিল। বরং তাদের কেউ-কেউ হযরত ইসা (আ.) এর সময় ইলহাম (যার কাছে আল্লাহ পক্ষ হতে ইলহাম হয়) হওয়ার দাবি করত। কিন্তু মুসার সাথে খোদার একটি সম্পর্ক ছিল–যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এজন্য অন্ধ বালম এই সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত ছিল এবং যিনি তার চেয়ে বড় ছিলেন–তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মারা গেল। সুতরাং সর্বদা এই বাস্তব ঘটনা ঘটে থাকে, যারা খোদার বিশেষ প্রিয় ও বিশ্বস্ত বান্দা–তাদের সাথে খোদার সম্পর্ক এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, এই জড়বাদী অন্ধরা এটা দেখতে পায় না। এজন্য প্রত্যেক সাজ্জদনশীন ও মৌলভী তাকে প্রতিহত করার জন্য দন্ডায়মান হয়। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার সাথে নয় বরং খোদর সাথে হয়। হায় এটা কিভাবে হতে পারে, যে ব্যক্তিকে খোদা একটি মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যার মাধ্যমে খোদা পৃথিবীতে একটি বড় পরিবর্তন আনয়ন করতে চান এরূপ ব্যক্তিকে কতিপয় জাহেল কাপুরুষ, অপরিপক্ক, অসম্পূর্ণ এবং অবিশ্বস্ত সাধকের জন্য বিনাশ করে দেবেন? যদি এরূপ দু'টি নৌকার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়–যার মধ্যে একটি নৌকা এরূপ, যাতে ন্যায় বিচারক কোমলপ্রাণ দয়ালু এবং সৎস্বভাব বিশিষ্ট যুগ বাদশাহ নিজের বিশেষ পরিষদসহ অবস্থিত আছেন এবং দ্বিতীয় নৌকাটিতে কতিপয় মেথর বা চামার বা কদাচারী বদমাশ কুৎসিত লোক বসে আছে এবং এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, একটি নৌকাকে রক্ষা করতে হবে এবং আরোহীসমেত দ্বিতীয় নৌকাটিকে ধ্বংস করতে হবে, তাহলে বল–এমতাবস্থায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উত্তম হবে? এ ন্যায় বিচারক বাদশাহর নৌকা ধ্বংস করা হবে না–কি ঐ হীন ও কদর্য বদমাশের নৌকা ধ্বংস করা হবে? আমি সত্য–সত্যই বলছি, পূর্ণ জোর ও সমর্থনের সাথে বাদশাহর নৌকাকে রক্ষা করা হবে। এবং ঐসব মেথর ও চামারের নৌকাকে ধ্বংস করা হবে এবং সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে বিনাশ করা হবে। তাদের বিনাশ সাধনে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। কেননা, জগদ্বাসীর জন্য ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর প্রয়োজন অত্যাধিক বেশি এবং তার মরে যাওয়া একটি জগতের মরে যাওয়ার শামিল। যদি কিছু মেথর ও চামার মরে যায় তাহলে তাদের মৃত্যুর দরুণ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় কোন

অন্তরায় সৃষ্টি হবে না। সুতরাং খোদাতায়ালার এটাই বিধান, যখন তার প্রেরিত পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্য একটি দল দন্ডায়মান হয় তখন তারা নিজেদের যতই পুণ্যাত্মা মনে করুক না কেন, খোদাতায়ালা তাদের বিনাশ করেন এবং তাদের বিনাশের সময় এসে যায়। কেননা, তিনি চান না–যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কোন নবীকে প্রেরণ করেন তাকে বিনাশ করা হোক। কেননা যদি তিনি এরূপ করেন, তবে তিনি স্বয়ং নিজ লক্ষ্যের শত্রু হবেন।

এরপর তবে পৃথিবীতে কে তাঁর ইবাদত করবে? জগদ্বাসী সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে থাকে এবং মনে করে, এই দলটি বড়–কাজেই এটিই উত্তম দল। নির্বোধেরা মনে করে এই সকল লোক সংখ্যায় হাজার-হাজার এবং তারা লক্ষ-লক্ষ মসজিদে একত্রিত হয়, এরা কি খারাপ হতে পারে? কিন্তু খোদা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। তিনি হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। খোদার বিশেষ বান্দাদের মধ্যে ঐশী প্রেম, সততা ও বিশ্বস্ততার এরূপ একটি জ্যোতি থাকে–যদি আমি তা বর্ণনা করতে পারতাম তবে বর্ণনা করতাম। কিন্তু আমি কি বর্ণনা করব! পৃথিবী সৃষ্টি হতে এপর্যন্ত কোন নবী বা রাসুল এই রহস্য বর্ণনা করতে পারেননি। খোদার বিশ্বস্ত বান্দাদের আত্মা তাঁর দরবারে এমনভাবে অবনত হয়, তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার কাছে নেই।

এরপর এই ভবিষ্যদ্বাণীর অবশিষ্টাংশের আনুবাদ করে এই বিষয়টি শেষ করছি। খোদাতায়ালা বলেন, যদিও আমি তোমাকে হত্যা হওয়া থেকে বাঁচাব, কিন্তু **তোমার জামাতের দু'টি ছাগলকে যবাই করা হবে** এবং পৃথিবীর প্রত্যেকেই অবশেষে লয়প্রাপ্ত হবে; অর্থাৎ তাদের নির্দোষ ও নিষ্পাপ অবস্থায় হত্যা করা হবে। খোদাতায়ালার কিতাবের বাগধারা অনুযায়ী নির্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ছাগলের সাদৃশযুক্ত করা হয়ে থাকে। এবং কখনও-কখনও গাভীর সঙ্গেও সাদৃশযুক্ত করা হয়ে থাকে। সুতরাং খোদাতায়ালা এই স্থলে 'মানুষ' শব্দের পরিবর্তে 'ছাগল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কেননা ছাগলের দু'টি গুণ রয়েছে। তা দুধও দেয় এবং এর মাংসও খাওয়া হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শহীদ মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ এবং তার মুরীদ শহীদ আব্দুর রহমান সম্পর্কে যা 'বারাহীনে আহমদীয়া' লেখার তেইশ বছর পর পূর্ণ হয়েছে। এই যাবত লক্ষ-লক্ষ ও কোটি-কোটি মানুষ ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার কিতাব বারাহীনে

আহমদীয়ার ৫১১ পৃষ্ঠায় পড়ে থাকবেন। প্রকাশ থাকে, আমি এইমাত্র লিখেছি, ছাগলের দু'টি গুণের মধ্যে একটি হল দুধ দেয়া এবং অপরটি তার মাংস খাওয়া। ছাগলের এই দু'টি গুণই মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব মরহুমের শাহাদাতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কেননা, উল্লেখিত মৌলভী সাহেব বিতর্কের সময় বিবিধ তত্ত্বজ্ঞান ও প্রকৃত সত্য বর্ণনা করে বিরুদ্ধবাদীদের দুধ দান করেছিলেন–যদিও হতভাগা বিরুদ্ধবাদীরা ঐ দুধ পান না করে ছুঁড়ে ফেলেছিল। এরপর শহীদ মরহুম নিজ প্রাণের কুরবানি দ্বারা তাদের মাংস দান করেন এবং নিজ রক্ত প্রবাহিত করেন–যাতে বিরুদ্ধবাদীরা তার মাংস ভক্ষণ করে এবং ভালবাসার রঙে তার রক্তপান করে এবং এভাবে পবিত্র কুরবানি দ্বারা উপকৃত হয়। ভেবে দেখুন, যে বিশ্বাসের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যার উপর তাদের বাপ-দাদারা মরে গেছে, তারা কি কখনও এমন দেখিয়েছে? এরূপ সততা ও নিষ্ঠা কেউ কি কখনও দেখিয়েছে? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে খোদাকে না দেখে তার পক্ষে এরূপ কুরবানি করা কি সম্ভব? পৃথিবী শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এরূপ রক্ত এবং এরূপ মাংস সর্বদা সত্যান্বেষীদের নিজেদের দিকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকবে। মোটকথা, যেহেতু সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেবের এই দু'টি গুণের দরুণ ছাগলের সাথে তার খুব সাদৃশ্য ছিল এবং মিঞা আব্দুর রহমানও ছাগলের সাথে সাদৃশ্য রাখতেন, সেহেতু তাদের ছাগল নামে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু খোদাতায়ালা অবগত ছিলেন, এই লেখক এবং তার জামাত এই অন্যায় হত্যার দরুন অত্যন্ত বেদনাহত হবে, সেহেতু এই ওহীর অব্যাবহিত পরের বাক্যগুলিতে সান্তনা এবং কুশল সংবাদের রঙে কালাম অবতীর্ণ করেছেন–যা আমি ইতোপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি। এর অনুবাদ হলো এই বিপদ এবং এই কঠিন আঘাতে তুমি শোকাভিভূত ও দুঃখিত হয়ো না। কেননা যদিও তোমার দু'জন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তবুও খোদা তোমার সাথে আছেন। এই দু'জনের বিনিময়ে তোমকে একটি জাতি দান করা হবে এবং খোদা স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট। তুমি কি জান না, খোদা সব কিছুর উপর শক্তিশালী? এসকল লোক–যারা উপরোক্ত দুই মযলুমকে শহীদ করবে আমি কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে তোমার কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করব–কি অপরাধে এরা তাদের শহীদ করেছিল। খোদা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমার নামকে পূর্ণ করবেন। অর্থাৎ, আহমদ নামকে পূর্ণ করবেন; যার অর্থ–খোদার খুব প্রশংসাকারী। ঐ ব্যক্তিই খোদার অতি প্রশংসা করেন, যার

উপর খোদার অনেক পুরস্কার ও আশীষ অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এর অর্থ এই, খোদা তোমার উপর পুরস্কার ও আশীষের বারিধারা বর্ষণ করবেন। তুমি সবচেয়ে অধিক তাঁর প্রশংসা করবে। তখন তোমার আহমদ নাম পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর খোদাতায়ালা বলেন, এই শহীদের নিহত হওয়ার দরুন দুঃখিত হয়ো না। তাদের শাহাদাতের মধ্যে খোদার হিকমত ও প্রজ্ঞা নিহিত আছে। অনেক বিষয় আছে যা তুমি চাও ঘটে যাক, কিন্তু ঐগুলো ঘটে যাওয়ার মধ্যে তোমার কল্যাণ নেই। অন্য দিকে অনেক বিষয় আছে যা তুমি চাও না ঘটুক কিন্তু ঐগুলি ঘটার মধ্যেই তোমার কল্যাণ আছে। খোদা ভালভাবে জানেন, কিসে তোমার কল্যাণ। কিন্তু তুমি তা জান না। খোদার এসব ওহীতে এটা বুঝানো হয়েছে, যদিও সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ মরহুমের এই নির্দয় হত্যা এমন একটি ঘটনা, যা শ্রবণ করলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। (আমরা এর চেয়ে জঘন্য যুলুম দেখিনি), কিন্তু এই হত্যাকান্ডে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে, যা পরে প্রকাশিত হবে এবং কাবুলের ভূমি প্রত্যক্ষ করবে, এই রক্ত কখনও বৃথা যাবে না। এর হত্যা করা হয়েছে এবং খোদা চুপ ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি এই খুনে চুপ থাকবেন না। এর বড়-বড় ফল প্রকাশিত হবে। সম্প্রতি শুনা গেছে, যখন শহীদ মরহুমকে হাজার-হাজার পাথর দ্বারা হত্যা করা হয়, ঐ সময় কাবুলে মারাত্মক কলেরার প্রাদুর্ভাব হয় এবং অনেক অঞ্চলের অনেক বড়-বড় ব্যক্তি এর শিকার হন এবং কোন আমীরের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবও এই জগৎ হতে বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু এতো কেবল শুরু। বড় নির্দয়ভাবে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত করা হয়েছে।

**আকাশের নীচে এই যুগে এরূপ হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। আক্ষেপ, এই নির্বোধ আমীর কি করল! এভাবে নির্দোষ ব্যক্তিকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করে সে নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনল। হে কাবুলের ভূমি! তুমি সাক্ষী থাক, তোমার উপর দাঁড়িয়ে মারাত্মক অপরাধ সংঘটন করা হয়েছে। হে হতভাগ্য ভূমি! তুমি খোদার দৃষ্টিতে হীন হয়ে গেছ, কেননা তুমি এই ভয়ঙ্কর যুলুমের স্থান।**

# মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেব মরহুমের এক অলৌকিক ক্রিয়া

যখন আমি এই পুস্তকটি লিখতে আরম্ভ করি তখন আমার ইচ্ছা ছিল, ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৩ ইং তারিখে গুরুদাসপুরে যে ফৌজদারী মোকদ্দমাটি আমার বিরুদ্ধে একজন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ হতে দায়ের করা হয়েছিল, উক্ত মোকদ্দমায় যাওয়ার পূর্বেই এই পুস্তকটি প্রণয়ন করব এবং সঙ্গে নিয়ে যাব। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার যকৃতের মারাত্মক ব্যথা দেখা দিল। আমি ভাবছিলাম, এই কাজ অসমাপ্ত থেকে গেল। কেবল ২/৪ দিন বাকি আছে। যদি আমি এভাবে এই যকৃতের ভয়ংকর ব্যথায় আক্রান্ত থাকি, তাহলে এর প্রণয়ন সমাপ্ত হবে না। তখন খোদাতায়ালা আমাকে দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করালেন। আমি রাত্রি বারটার পর আমার বাড়ির লোকদের বললাম, "এখন আমি দোয়া করছি। তোমরা 'আমীন' বল। সুতরাং আমি ঐ কষ্টের অবস্থাতেই সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফের স্মরণে দোয়া করলাম 'হে ইলাহী! এই মরহুমের জন্য আমি এই পুস্তকটি লিখতে চেয়েছিলাম।' তখন সাথে-সাথেই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম এবং আমার প্রতি ইলহাম হল, 'সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহিম। অর্থাৎ, শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে। এটা দয়ালু খোদার কালাম। অতএব, ঐ সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ভোর ছয়টার পূর্বেই আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেলাম এবং ঐ দিনই প্রায় অর্ধেক পুস্তক লিখে ফেললাম। এজন্য আল্লাহর প্রশংসা।

# আমার জামাতের মনযোগের জন্য একটি জরুরী বিষয়

যদিও আমি ভালভাবে জানি, আমার জামাতের কোন-কোন ব্যক্তি এখনও আধ্যাত্মিক দুর্বলতার অবস্থায় রয়েছে, এমনকি কারও-কারও পক্ষে নিজেদের অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকাও কঠিন হয়ে পড়েছে, কিন্তু যখন আমি সাহেবযাদা মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ মরহুম কর্তৃক প্রকাশিত দৃঢ়চিত্ততা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতি লক্ষ্য করি তখন আমার জামাত সম্বন্ধে আশা ও প্রত্যাশা অত্যন্ত বেড়ে যায়! কেননা, যে খোদা এই জামাতের কোন-কোন ব্যক্তিকে এই শক্তি দান করেছেন, তাঁরা কেবল ধন–সম্পদই কুরবানি করেন না বরং এই পথে নিজেদের প্রাণ কুরবানি করেছেন, এতে সুস্পষ্টরূপে মনে হয়, ঐ খোদার ইচ্ছা যে, তিনি এভাবে বহু ব্যক্তিকে জামাতে সৃষ্টি করবেন যাদের মধ্যে সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফের মন ও মানসিকতা বিরাজ করবে। এরা তার আধ্যাত্মিকতার একটি নতুন চারা হবে, যেমন আমি দিব্য-দৃষ্টিতে উক্ত মৌলভী সাহেবের শাহাদাতের ঘটনার প্রাক্কালে দেখেছি, আমাদের বাগান হতে সরো বৃক্ষের একটি উচ্চ শাখা কাটা হয়েছে। আমি বললাম, এই শাখাটিকে আবার মাটিতে পুঁতে ফেল যা থেকে এটা বৃদ্ধি পায় ও প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং আমি এর তাবির করলাম, খোদাতায়ালা তাঁর অনেক স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করবেন। অতএব আমি

---

* এর পূর্বে যখন তিনি জীবিত ছিলেন, বরং কাদিয়ানেই অবস্থান করছিলেন তখন সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব মরহুম সম্বন্ধে খোদার একটি সুস্পষ্ট ওহী হয়েছিল। খোদার এই ওহী ১৯০৩ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আল-হাকামে ও ১৯০৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে বদরের ২নং কলামে প্রকাশিত হয়েছিল। এটা মৌলভী সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে ছিল। তা এই,

قتل خيبة وزيد هيبة

অর্থাৎ, এরূপ অবস্থায় মারা গেল, তাঁর বক্তব্য কেউ শুনল না এবং তাঁর মৃত্যু একটি ভয়ংকর ঘটনা ছিল। অর্থাৎ, এটা লোকদের কাছে অত্যন্ত ভয়ংকর মনে হয়েছিল এবং হৃদয়ের উপর এর বড় প্রভাব পড়েছিল।

বিশ্বাস রাখি, কোন এক সময়ে আমার এই দিব্য-দর্শনের তাবির প্রকাশিত হবে। কিন্তু এখনও অবস্থা এরূপ, আমি যদি এই সিলসিলাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য জামাতের কাছে সামান্য কথাও পেশ করি তাহলে সাথে-সাথেই আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হয়, পাছে এই কথা দ্বারা কেউ পরীক্ষায় না পড়ে যায়।

এখন আমি সেই জরুরী কথাটি জামাতের কাছে পেশ করতে চাইছি। তাহলো, আমি দেখছি, আমার জামাত লঙ্গরখানার জন্য মাঝে–মাঝে যে পরিমাণ সাহায্য করে থাকে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। হ্যাঁ, এই সাহায্যের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব বেশি অংশগ্রহণ করেছে এর কারণ হলো, পাঞ্জাবের লোক প্রায়শ আমার কাছে আসা-যাওয়া করে থাকে। যদি গাফিলতির জন্য হৃদয়ে কোন কাঠিন্য এসে যায় তবে সংস্পর্শ এবং ক্রমাগত সাক্ষাতের ফলে এই কাঠিন্য খুব শীঘ্র দূর হয়ে যায়। এজন্য পাঞ্জাবের লোকেরা বিশেষভাবে কোন-কোন ব্যক্তি তাদের ভালবাসায়, সত্যনিষ্ঠায় ও সদ্‌গুণে উন্নতি করে যাচ্ছে। এই কারণেই তাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করে এবং সত্যিকারের আজ্ঞানুবর্তিতার প্রকাশ তাদের মধ্যে দেখা যায়। এবং এই দেশের লোকদের হৃদয় অন্যান্য দেশের লোকদের তুলনায় কিছুটা কোমলও বটে। এতদসত্ত্বেও যদি আমি দূরদেশের সকল শিষ্যকে এরূপ মনে করি, তারা এখনো সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতায় আদৌ অগ্রসর হয়নি তাহলে এটি বড়ই অন্যায় কথা হবে। কেননা, সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব–যিনি প্রাণ বিসর্জন করে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তিনিও তো দূরদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, সদগুণাবলী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে পাঞ্জাবের বড়-বড় আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিকেও লজ্জিত হতে হয়। আমাকে বলতে হয়, তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে চলে গেলেন। অনুরূপভাবে কোন-কোন দূরদেশের আদর্শপরায়ণ বক্তি বড়-বড় আর্থিক কুরবানি করেছেন এবং তাদের সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতায় কখনও কমতি আসেনি। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের ভ্রাতা মাদ্রাজের ব্যবসায়ী শেঠ আব্দুর রহমান এবং আরও কতিপয় বন্ধুর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সংখ্যার দিক হতে পাঞ্জাবকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। কেননা পাঞ্জাবে সকল শ্রেণীর মানুষ ধর্মের সেবায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে চলছে। দূরদেশের অনেক লোক যদিও আমার সিলসিলায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু তবুও তারা আমার সংস্পর্শে আসার সুযোগ কম পাওয়ার দরুন তাদের হৃদয় দুনিয়ার কলুষ হতে

সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়নি। বিষয়টি এভাবে মনে হচ্ছে যে, পরিণামে হয়তো তারা কলুষ হতে পবিত্র হয়ে যাবে, নচেৎ খোদাতায়ালা তাদের এই পবিত্র জামাত হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মৃত্যু ঘটবে। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষের এক পরম ভ্রান্তি। এই ঘৃণ্য ও লক্ষ্মীছাড়া দুনিয়া কখনও ভয় দেখিয়ে এবং কখনও আশার প্রলোভন দেখিয়ে অনেক মানুষকে নিজের বেড়াজালে আটকে নেয় এবং তাতে তারা প্রাণত্যাগ করে। নির্বোধেরা বলে, আমরা কি দুনিয়া ত্যাগ করব? কিন্তু তোমাকে বলছি, হৃদয়কে দুনিয়া ও দুনিয়ার প্রতারণা হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেল। নতুবা তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যে পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি সীমা অতিক্রম করে থাক, এমনকি খোদার ফরযসমূহও বিসর্জন দাও এবং বিভিন্ন রকম প্রতারণার দরুন শয়তানে পরিণত হও, বস্তুত এই পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি পাপের বীজ বপন করেছ এবং তাদের এজন্য ধ্বংস করছ যে, খোদা তোমার হৃদয়ের গভীরে দেখছেন। অতএব তুমি অসময়ে মারা যাবে এবং পরিবার-পরিজনদের ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিবে। কিন্তু খোদার দিকে যে অবনত–তার সৌভাগ্যের কারণে তার স্ত্রী-পুত্রও অংশ লাভ করবে এবং তার মৃত্যুর পর এরা কখনও ধ্বংস হবে না।

যেসব লোক আমার সাথে খাঁটি সম্পর্ক রাখে তারা হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখতে থাকে এবং আমার সংস্পর্শের আশীষ লাভ করার জন্য খোদাতায়ালার কাছে দোয়া করতে থাকে। কিন্তু আফসোস! আমি দেখছি, এভাবে কিছু লোকও আছে যারা সাক্ষাতের পর বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে একটি পোষ্টকার্ডও লিখে না। এতে আমি এই কথাই বুঝি, তাদের হৃদয় মরে গেছে। তাদের অভ্যন্তরীণ চেহারায় কুষ্ঠের চিহ্ন আছে। আমি তো অনেক দোয়া করি যেন আমার জামাতের সকলে ঐসব লোকের মত হয়ে যায়–যারা খোদাতায়ালাকে ভয় করে নামাযে কায়েম থাকে, রাত্রে ওঠে সেজদারত হয়ে ক্রন্দন করে ও খোদার ফরযসমূহকে বিনষ্ট করে না। তারা কৃপন, দানবিমুখ ও গাফেল নয়। তারা পৃথিবীর কীট নয়। আমি আশা রাখি, খোদা আমার দোয়া কবুল করবেন এবং আমাকে দেখাবেন, আমি আমার পশ্চাতে এমন লোকই রেখে যাব। কিন্তু যাদের চোখ ব্যাভিচার করে এবং যাদের হৃদয় পায়খানা হতেও নিকৃষ্ট এবং যারা কখনও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না, আমি ও আমার খোদা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। **আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব**

**যদি এই সকল লোক এই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। কেননা খোদা এই জামাতকে এরূপ একটি জাতি বানাতে চান, যাদের আদর্শ দেখে মানুষ খোদাকে স্মরণ করবে এবং যারা তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে।** কিন্তু ঐ সকল ফাসাদপরায়ণ লোক, যারা আমার হাতে হাত রেখে ধর্মকে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে বলে বয়াত গ্রহণ করার পর নিজেদের ঘরে ফিরে গিয়ে এরূপ ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তাদের হৃদয়ে দুনিয়াদারী ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের দৃষ্টি পবিত্র নয়; তাদের হৃদয় পবিত্র নয়; তাদের হাত দিয়ে কোন পুণ্য কাজ সাধিত হয় না; তাদের পা কোন পুণ্য কাজের জন্য তৎপর হয় না। তারা ঐ মুষিকের ন্যায়–যা অন্ধকারেই বড় হতে থাকে এবং তাতেই অবস্থান করে এবং তাতেই মারা যায়। তারা আকাশে আমার জামাত হতে কর্তিত হয়েছে তারা বৃথাই একথা বলে, আমরা এই জামাতে প্রবেশ করেছি। কেননা, আকাশে তারা জামাতভূক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। যারা আমার এই নির্দেশ মানে না যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনে একটি পবিত্র বিপ্লব ঘটে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তারা পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র সংকল্পের মানুষ হয়ে যাবে; নোংরামি এবং হারামখোরীর সব পোশাক নিজেদের দেহ হতে ছুঁড়ে ফেলবে; মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং খোদার প্রকৃত আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যাবে এবং নিজেদের সকল আত্মপ্রাধান্যকে বিদায় দিয়ে আমার পশ্চাতে অনুগমন করবে–আমি এরূপ ব্যক্তিদের ঐ কুকুরের সাথে তুলনা করি, যে এরূপ জায়গা হতে পৃথক হয় না, যেখানে মৃতদেহ ফেলা হয় এবং যেখানে বিকৃত ও গলিত লাশ থাকে। আমি কি ঐ সব লোকের মুখাপেক্ষী–যারা মৌখিকভাবে আমার সাথে রয়েছে এবং এভাবে তারা লোক দেখানো একটি জামাত? আমি সত্য-সত্যই বলছি, যদি সকল মানুষ আমাকে ছেড়ে যায় এবং একজনও আমার সাথে না থাকে, তাহলে আমার খোদা আমার জন্য অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন–যারা সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এদের চেয়ে উত্তম হবে। একটি ঐশী আকর্ষণ কাজ করছে, যার ফলে সৎ ও সরলপ্রাণ লোকেরা আমার দিকে দৌড়ে আসছে। এই ঐশী আকর্ষণকে বাধা দেয়ার সাধ্য কারো নেই। কোন-কোন লোক খোদার চেয়ে নিজের চালাকি ও প্রতারণার উপর অধিক ভরসা করে। সম্ভবত তাদের হৃদয়ে এই কথাটি লুকিয়ে রয়েছে, 'নবুওয়ত ও রিসালত' এসব বিষয়ে মানুষের চালাকি, এবং দৈবক্রমে এগুলি প্রচারিত ও গৃহীত হয়ে থাকে।

এই ধারণা অপেক্ষা ঘৃণ্য ধারণা আর নেই এরূপ ব্যক্তিরা অভিশপ্ত, এরূপ স্বভাব অভিশপ্ত! খোদা তাদের লাঞ্ছিত করে মৃত্যু দিবেন। কেননা, তারা খোদার কার্যালয়ের শত্রু। এরূপ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক এবং এদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই কর্দমাক্ত। তারা নারকীয় জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুর পর নরকের অগ্নি ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না।

এখন সংক্ষেপে কথা হচ্ছে, এই যে লঙ্গরখানা এবং ইংরেজী ও উর্দুতে প্রকাশিত সাময়িকী–যার জন্য অধিকাংশ বন্ধু উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করেছেন এগুলি ব্যতিরেকে কাদিয়ানে একটি মাদ্রাসাও খোলা হয়েছে। এতে এই উপকার সাধিত হচ্ছে, একদিকে কম বয়সী ছেলেরা শিক্ষা লাভ করছে এবং অন্যদিকে তারা আমার সিলসিলার নীতি সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। এভাবে খুব সহজে একটি জামাত তৈরী হয়ে যায়। বরং কোন-কোন সময়ে তাদের পিতা-মাতারাও সিলসিলায় প্রবেশ করে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এই মাদ্রাসা বড় অসুবিধার মধ্যে রয়েছে।

যদিও আমার অতি প্রিয় ভাই মালীর কোটলার প্রধান নবান মোহাম্মদ আলী খান সাহেব মাসিক ৮০ টাকা এই মাদ্রাসার জন্য সাহায্য প্রদান করছেন, তবুও শিক্ষকদের বেতনও মাসে-মাসে আদায় করা হচ্ছে না। মাথার উপর শত-শত টাকার ঋণ থেকে যাচ্ছে। এছাড়া মাদ্রাসার জন্য কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এ যাবত এই গৃহগুলি নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। অন্যান্য চিন্তা ছাড়াও এ চিন্তাটি আমাকে ব্যাকুল করছে। এই ব্যাপারে কি করণীয় আছে তা সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। অবশেষে একটি উপায় আমার মনে উদয় হল, আমি এখন আমার জামাতের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের ভালভাবে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ করব, যদি তারা পূর্ণ মনযোগের সাথে এই মাদ্রাসার জন্যও মাসিক চাঁদা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়, তাহলে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে কিছু না কিছু নির্ধারণ করা উচিত। এই ব্যাপারে কখনও তাদের পিছু হটা উচিত নয়। কোন বিশেষ কারণে কেউ যদি অপারগ হয়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। যারা চাঁদা দিতে অসমর্থ হবেন তাদের জন্য বিশেষভাবে এই চিন্তা করা হয়েছে, লঙ্গরখানার জন্য তারা যে অর্থ প্রেরণ করেন তার এক–চতুর্থাংশ মাদ্রাসার জন্য উল্লেখিত নবাব সাহেবের নামে প্রেরণ করবেন। লঙ্গরখানার সাথে একত্রে অর্থ প্রেরণ করা কখনও তাদের উচিত হবে না। বরং পৃথক 'মানি-অর্ডার' যোগে

প্রেরণ করা উচিত হবে। যদিও প্রতিদিন আমাকে লঙ্গরখানার কথা ভাবতে হয় এবং এর চিন্তা সরাসরি আমার উপর বর্তায় এবং এজন্য আমার সময় নষ্ট হয়, তবুও মাদ্রাসার চিন্তাও আমাকে ব্যাকুল করে। সুতরাং আমি এই সিলসিলার সাহসী বন্ধুদের কাছে সর্বতোভাবে আশা পোষণ করি, তারা আমার এই আবেদনকে আবর্জনার ন্যায় ছুঁড়ে ফেলবে না এবং পূর্ণ মনযোগের সাথে এই বিষয়ে তৎপর হবে। আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলি না; বরং ঐ কথাই বলি যা খোদাতায়ালা আমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত করেন। এই বিষয়টির উপর আমি অনেক ভেবেছি এবং বার-বার এর বিশ্লেষণ করে দেখেছি। আমি উপলব্ধি করেছি, কাদিয়ানের এই মাদ্রাসাটি যদি দাঁড়িয়ে যায় তাহলে এটা বড় আশীষের কারণ হবে এবং এর মাধ্যমে নতুন শিক্ষাপ্রাপ্তদের একটি দল আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও এটা অবগত আছি, অধিকাংশ শিক্ষার্থী ধর্মের জন্য অধ্যায়ন না করে জাগতিক উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করে এবং তাদের পিতা-মাতাদের ধ্যান-ধারণাও এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; তবুও প্রতিদিনের সংস্পর্শে নিশ্চয়ই প্রভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি ২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জনও এভাবে বের হয়–যার মন-মস্তিক ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং যে আমাদের সিলসিলা ও আমাদের শিক্ষার উপর আমল করতে শুরু করে, তবুও আমি মনে করব, এই মাদ্রাসা নির্মাণের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। অবশেষে এ-ও স্মরণ রাখতে হবে, এই মাদ্রাসা সর্বদা অসুবিধায় ও এহেন দুর্বল অবস্থায় থাকবে না। বরং আমি বিশ্বাস করি, ছাত্রদের ফিস দ্বারা অনেক সাহায্য হবে, বা তা যথেষ্ট হবে। অতএব তখন লঙ্গরখানার অর্থ কেটে মাদ্রাসাকে দেয়ার দরকার হবে না। সুতরাং প্রাচুর্য লাভ হওয়ার পর আমার এই নির্দেশ রহিত হয়ে যাবে এবং লঙ্গরখানা–যা প্রকৃতপক্ষে একটি মাদ্রাসাই বটে, এটা নিজ অর্থের এক-চতুর্থাংশ পুনরায় ফিরে পাবে। এই কঠিন উপায়টি, যদ্বারা লঙ্গরখানার ক্ষতি হবে, তা আমি কেবলমাত্র এজন্য অবলম্বন করেছি, দৃশ্যত আমার মনে হয়, যে পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন নতুন চাঁদায় তা সম্ভবত মিটতে না-ও পারে। কিন্তু যদি খোদার ফযলে এই প্রয়োজন মিটে যায় তাহলে এই কর্তন দরকার হবে না। আমি লঙ্গরখানাকে এজন্য মাদ্রাসা বলে আখ্যায়িত করেছি, যে সকল মেহমান আমার কাছে আসেন, যাদের জন্য লঙ্গরখানা চালু রয়েছে, তারা আমার উপদেশ শুনে থাকেন এবং আমি বিশ্বাস করি, যেসব লোক সর্বদা আমার উপদেশ শ্রবণ করেন খোদাতায়ালা তাদের হেদায়াত দান করবেন এবং তাদের হৃদয়কে উম্মুক্ত করবেন। এখন আমি এখানেই সমাপ্ত করছি এবং খোদাতায়ালার কাছে এই কামনা করছি, আমি যে

দাবি পেশ করেছি তিনি আমার জামাতকে এটা পূর্ণ করার সামর্থ দান করুন এবং ধন-সম্পদে বরকত দান করুন এবং এই পুণ্যকর্মের জন্য তাদের হৃদয়কে খুলে দিন। আমীন। পুনরায় আমীন। ওয়াসসালামু আলা মানিত্তা বায়াল হুদা (শান্তি তার উপর–যে হেদায়াত অনুসরণ করে)।

# মরহুম হযরত সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেবের পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা

হযরত সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেবের বিশেষ শিষ্য মিয়া আহমদ নুর ১৯০৩ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে স্ব-পরিবারে খোসত হতে কাদিয়ানে পৌঁছেন। তিনি বর্ণনা করেন, মৌলভী সাহেবের মৃতদেহ এক নাগাড়ে ৪০ দিন পর্যন্ত ঐ তাঁকে সঙ্গেসার করা পাথরের নীচে পড়েছিল। এরপর আমি কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলিত হয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাঁর পবিত্র মৃতদেহ বের করে সংগোপনে শহরে নিয়ে আসলাম। সন্দেহ ছিল, আমীর এবং তার কর্মচারীরা বাধা দিবে। কিন্তু শহরে এমনভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব হল, প্রত্যেকে নিজেদের বিপদ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল। সুতরাং আমরা সহজেই মরহুম মৌলভী সাহেবের মৃতদেহ কবরস্থানে নিয়ে গেলাম এবং জানাযা পড়িয়ে তাঁকে সেখানে সমাহিত করলাম। এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার ছিল, যখন মৌলভী সাহেবকে পাথরের স্তুপ হতে বের করা হল তখন তাঁর দেহ হতে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধ বের হচ্ছিল। এতে লোকেরা খুব প্রভাবান্বিত হল।

এই ঘটনা ঘটার পূর্বে কাবুলের আলেমগণ আমীরের আদেশক্রমে মৌলভী সাহেবের সাথে বিতর্কের জন্য সমবেত হয়েছিল। মৌলভী সাহেব তাদের বলেন, তোমাদের দু'জন খোদা আছে। কেননা, তোমরা আমীরকে এমন ভয় কর–যেভাবে খোদাতায়ালাকে ভয় করা উচিত। কিন্তু আমার খোদা একজন। এজন্য আমি আমীরকে ভয় করি না। গ্রেফতারের পূর্বে যখন তিনি গৃহে ছিলেন এবং গ্রেফতারের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না, তখন তিনি স্বীয় হাত দু'টিকে সম্বোধন করে বলেন, হে আমার হস্তদ্বয় ! তোমরা কি হাত কড়া সহ্য করতে পারবে ? এতে তাঁর গৃহের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মুখ হতে একি কথা বের হল ? তখন তিনি বলেন, আসরের নামাযের পর তোমরা জানতে পারবে ব্যাপারটা কি। আসরের নামাযের পর হাকিমের সিপাহীরা এসে তাঁকে গ্রেফতার করল। গৃহের লোকদের তিনি উপদেশ দিয়ে বললেন, আমি

যাচ্ছি, কিন্তু দেখ, এমন যেন না হয় যে, তোমরা অন্য কোন পথ অবলম্বন করে বস। যে ইমান ও আকিদার উপর আমি প্রতিষ্ঠিত আছি তোমাদের ইমান ও আকিদা তা-ই হওয়া উচিত। গ্রেফতার হওয়ার পর রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন, আমি এই জনসমাবেশের প্রধান ব্যক্তি। বিতর্কের সময় আলেমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ঐ কদিয়ানি ব্যক্তির পক্ষে কি বল–যে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবি করে? তখন মৌলভী সাহেব উত্তর প্রদান করেন, আমরা ঐ ব্যক্তিকে দেখেছি এবং তার ব্যাপারে অনেক চিন্তা করেছি। তার মত ব্যক্তি পৃথিবীতে কেউ নেই এবং সন্দেহাতীতভাবে **তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তিনি মৃতদের জীবিত করছেন**। মোল্লারা চিৎকার করে বলে, সে কাফের এবং তুমিও কাফের এবং তাকে আমীরের পক্ষ হতে তওবার পরিবর্তে সঙ্গেসারের ধমক দেয়া হল। এতে তিনি বুঝেলেন, তিনি মারা যাবেন। তখন তিনি এই আয়াতটি পড়েন :-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিলদা দুন্‌কা রাহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওহ্‌হাব।"

অর্থাৎ, হে আমাদের খোদা। আমাদের হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না। তুমি আমাদের যে হেদায়াত দিয়েছ তার পদস্খলন হতে আমাদের হেফাযত কর এবং তোমার কাছ থেকে আমাদের রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা। (সুরা আলে ইমরান : ৯)।

এরপর যখন তাকে পাথর মারতে লাগল তখন তিনি এই আয়াত পড়েন:-

أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِيْنَ

"আন্তা ওলিই ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি মুয়াফ ফানি মুসলিমাঁও ওয়াল হিকনি বিস সালিহিন।" অর্থাৎ, হে আমার খোদা তুমি ইহকালে ও পরকালে আমার অভিভাবক ও বন্ধু। আমাকে ইসলামে মৃত্যু দাও এবং তোমার নেক

বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সুরা ইউসুফঃ ১০২)। এরপর তার উপর পাথর নিক্ষেপিত হল এবং মরহুম হযরত শহীদকে করা হল। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)। সকাল হওয়ার সাথে-সাথেই কাবুলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হল। আমীর হাবিবুল্লা খানের আপন ভাই নসরুল্লাহ খান–যে এই হত্যাকান্ডর মূলে ছিল, তার ঘরে কলেরা দেখা দিল এবং তার স্ত্রী ও সন্তান মারা গেল। এবং প্রতিদিন প্রায় ৪০০ লোক মরতে লাগল। শাহাদাতের রাতে আকাশ লাল হয়েছিল। এর পূর্বে মৌলভী সাহেব বলতেন, আমার উপর বার বার ইলহাম হচ্ছে :-

اذهب الی فرعون انی معك اسمع و اری و انت محمد معنبر معطر

"ইযহাব ইলা ফিরআউনা ইন্নি মাআকা আসমায়ু ওয়াআরা ওয়া আন্তা মুহাম্মাদুন মুআনবারুন মুয়াত্তারুন।" (তুমি ফেরাউনের নিকট গমন কর, নিশ্চয় আমি তোমার সাথে আছি, আমি শ্রবণ করি এবং দর্শন করি এবং তুমি অতীব প্রশংসিত, তোমাকে কস্তুরী দ্বারা সুরভিত করা হয়েছে -অনুবাদক)। এবং বলেন, আমার উপর ইলহাম হয়, আকাশে হৈ–চৈ পড়েছে এবং পৃথিবী ঐ ব্যক্তির মত কাঁপছে, যে কাঁপানো জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। জগদ্বাসী তা জানে না। এই ঘটনা সংঘটিত হবে; এবং বলেন, আমার কাছে সর্বদা ইলহাম হচ্ছে, এই পথে নিজের শির দিয়ে দাও এবং ভ্রুক্ষেপ করো না। খোদা কাবুল ভূ-খন্ডের কল্যাণের জন্য এটাই চাচ্ছেন।

মিঞা আহমদ নুর বলেন, মৌলভী সাহেব দেড় মাস পর্যন্ত জেলে ছিলেন। কিন্তু পূর্বে আমি লিখেছিলাম, তিনি চার মাস জেলে ছিলেন। এটা বর্ণনার মতভেদ। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সবাই একমত। ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা। (শান্তি তার উপর যে হেদায়াত অনুসরণ করে-অনুবাদক)।

Tadhkira-tush-Shahadatain (the narrative of two martyrdoms) written in the year 1903 is one of the many books written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, of Qadian, India, the Promised Messiah and Mahdi (peace be on him). In this book he has related graphically two of the most brutal and heinous murders ever perpetrated in the history of religion. This most brutal martyrdom of two of his pledged devotees is all the more deplorable as it was committed in the name of Islam, the religion of peace, and would cause any reader to shudder with horror.

To surrender one's life in the name of faith for seeking the pleasure of Allah and to remain steadfast under the most trying conditions is indeed a very commendable act: The martyrdom of these two devotees deserves the highest praise, sympathy and love.

The martyr Hazrat Sahibzada Sayyad Abdul Latif was not only a highly placed and esteemed chief of Khost in Afghanistan, but was also the most reputed mentor of his country. The fame of his piety, knowledge and wisdom had spread even beyond the domains of Afghanistan.

The second martyr, Hazrat Mian Abdul Rahman, one of the most trusted pupils of the Sahibzada, was strangled to death in a very cruel manner for the very same reason of accepting the Promised Messiah.

The Promised Messiah has narrated how these two venerable persons joined the fold of Ahmadiyyat. He mentions the reason which made the Sahibzada fully convinced of his truth before taking the oath of allegiance at his sacred hand. The Sahibzada fulfilled this oath by surrendering his life even though many worldly honours were offered to him by the king if he retracted from his allegiance.

Readers should take note that in the original text of the book there are three articles in Arabic appended to the original Urdu text. The translations of these articles are not included in this rendering.

**Tadhkira-tush-Shahadatain**

by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
**The Promised Messiah and Imam Mahdi** as

translated into bengali by
**Nazir Ahmad Bhuiyan**

published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**

printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-016-9

978 984 991 016 9